Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

জিহাদ: ইসলাম ও আধুনিক ভূল ধারণা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মহিমা আক্তার

রোলঃ 228021637

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

জিহাদ: ইসলাম ও আধুনিক ভূল ধারণা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মহিমা আক্তার

রোলঃ 228021637

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " জিহাদ: ইসলাম ও আধুনিক ভূল ধারণা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মহিমা আক্তার, আইডিঃ 228021637 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " জিহাদ: ইসলাম ও আধুনিক ভূল ধারণা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

মহিমা আক্তার

আইডিঃ 228021637

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা

‘জিহাদ’ শব্দটি ইসলামি পরিভাষায় একটি কেন্দ্রীয় ও গভীরতর ধারণা, যার আভিধানিক অর্থ হলো—সংগ্রাম, চেষ্টা বা সাধনা। ইসলামের মৌলিক শিক্ষায় জিহাদ শুধুমাত্র যুদ্ধ নয়; বরং এটি আত্মশুদ্ধি, সমাজ সংস্কার, ন্যায়ের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে নৈতিক প্রতিবাদের প্রতীক। কুরআন ও হাদীসে জিহাদকে বহু মাত্রায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তবে দুঃখজনকভাবে, আধুনিক বিশ্বে এই গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ধারণাটি নানা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, মিডিয়ার মনগড়া প্রচার এবং চরমপন্থীদের ভুল ব্যবহার ও অপব্যাখ্যার ফলে বিকৃত হয়ে পড়েছে। পশ্চিমা মিডিয়ায় জিহাদ প্রায়শই “পবিত্র যুদ্ধ” বা “ইসলামিক সন্ত্রাস” হিসেবে চিত্রিত হয়, যা কুরআনের স্পষ্ট বাণীর সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এমনকি অনেক মুসলিম সমাজেও জিহাদ বিষয়ক শিক্ষার অভাব ও সঠিক ব্যাখ্যার অনুপস্থিতির কারণে তরুণ সমাজ বিভ্রান্ত হয়, এবং কখনো কখনো উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। ইতিহাসে যেমন দেখা যায়—জিহাদ কখনো রাজনৈতিক প্রতিরোধের হাতিয়ার, কখনো নৈতিক সমাজ গঠনের বাহন, আবার কখনো ধর্মীয় চিন্তার বিকাশের মাধ্যম। একদিকে আফগান প্রতিরোধ, ফিলিস্তিনি সংগ্রাম কিংবা ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে মুসলিম প্রতিরোধের মতো ঐতিহাসিক ঘটনা জিহাদের প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরে, অন্যদিকে চরমপন্থা বা আন্তর্জাতিক ‘War on Terror’ নীতির আওতায় এই একই ধারণাকে বিকৃত করে মুসলিম পরিচয় ও সংস্কৃতিকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে। এই গবেষণাপত্রে জিহাদের প্রকৃত তাৎপর্য, ইতিহাসে তার রূপান্তর, বর্তমান সময়ে প্রচলিত ভুল ধারণার রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব, এবং ইসলামি পণ্ডিতদের প্রামাণ্য ব্যাখ্যার আলোকে একটি স্বচ্ছ ও বাস্তবভিত্তিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো—জিহাদ সম্পর্কিত বিভ্রান্তি দূর করে এর আধ্যাত্মিক ও নৈতিক গুরুত্বকে তুলে ধরা, যাতে মুসলিম সমাজ চরমপন্থা থেকে রক্ষা পায় এবং বিশ্ব সমাজে ইসলামের মানবিক ও ন্যায়কেন্দ্রিক দর্শনের পুনরুজ্জীবন সম্ভব হয়।

১. জিহাদের ধারণা ইসলামী দৃষ্টিকোণ

‘জিহাদ’ অর্থ, আল্লাহ্ পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো’ এবং ‘ক্বিতাল’ অর্থ আল্লাহ্র পথে কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করা’। জিহাদ হ’ল ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া। পঞ্চস্তম্ভের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা পায়। কিন্তু চূড়া বা ছাদ না থাকলে তাকে পূর্ণাঙ্গ গৃহ বলা যায় না। চূড়াহীন গৃহের যে তুলনা, জিহাদবিহীন ইসলামের সেই তুলনা। জিহাদেই জীবন, জিহাদেই সম্মান ও মর্যাদা। জিহাদবিহীন মুমিন মর্যাদাহীন ব্যক্তির ন্যায়। জিহাদের মাধ্যমেই ইসলাম প্রতিষ্ঠা পায়। আল্লাহ্ জন্য মুসলমানের প্রতিটি কর্ম যেমন ইবাদত, আল্লাহ্র বিধান প্রতিষ্ঠায় মুসলমানের প্রতিটি সংগ্রামই তেমনি জিহাদ। দ্বীনের বিজয় জিহাদের উপরেই নির্ভরশীল। জিহাদ হ’ল মুমিন ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্যের অন্যতম মানদণ্ড। আল্লাহ বলেন, যারা ঈমানদার তারা যুদ্ধ করে আল্লাহ্র পথে। আর যারা কাফির, তারা যুদ্ধ করে ত্বাগূতের পথে। অতএব তোমরা শয়তানের বন্ধুদের সাথে যুদ্ধ কর। নিশ্চয়ই শয়তানের কৌশল সদা দুর্বল’।[1]

১.১ জিহাদের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা

বিশ্বের সর্বাধিক ব্যবহৃত জ্ঞানমূলক ওয়েবসাইট “Britannica” ‘জিহাদ’ শব্দের ব্যাখ্যায় লিখেছে, **জিহাদ** (আরবি: جهاد) শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো “সংগ্রাম” বা “পরিশ্রম”, এবং ইসলামী পরিপ্রেক্ষিতে এটি একটি নৈতিক ও ধার্মিক প্রচেষ্টাকে বোঝায়। এই পরিভাষার তাৎপর্য প্রসঙ্গনির্ভর; তবে পাশ্চাত্যে একে প্রায়শই ভুলভাবে “পবিত্র যুদ্ধ” (holy war) হিসেবে অনুবাদ করা হয়েছে। বাস্তবে, জিহাদ মূলত ন্যায়ের পক্ষে ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং নৈতিকভাবে প্রয়াস চালানোর একটি সার্বিক ধারণা।

‘জিহাদ ও জঙ্গীবাদ” গ্রন্থাকার ড. কাবীরুল ইসলাম লেখেন, জিহাদের আভিধানিক অর্থ সংগ্রাম, যুদ্ধ, প্রচেষ্টা, সাধনা, পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করা ইত্যাদি। الجهاد শব্দটি আরবী, যা। মূলধাতু থেকে উদ্ভূত।। অর্থ হচ্ছে কষ্ট, ক্লেশ। যেমন বলা হয় جهدت جهادا أي بلغت مشق ‘আমি অতি কষ্ট স্বীকার করেছি’।’[2] যেমন হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দো’আ করেছেন এভাবে- أني أعوذ بالله من جهد لاء। ‘আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি বিপদের কষ্ট থেকে’।’[3]

---

[1] নিসা ৪/৭৬

[2] ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী, ফাফুল বারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড (বৈরুত। দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৭৯ ৭২/১৪১৯ হিঃ), পৃঃ ১৩৩; মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ২য় খণ্ড (রিয়াদ: মাকতাবাতুল মা’আরিফ, ১ম প্রকাশ: ২০০০ খৃঃ/১৪২১ হিঃ), পৃঃ ৬৪, টাকা নং ১ দ্রঃ।

[3] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, হাদীছ নং ২৪৫৭ ‘ইস্তি’আযাহ’ অনুচ্ছেদ।

শক্তি-সামর্থ্য প্রয়োগ করা ও প্রচেষ্টা চালানো অর্থেও الجهاد শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়, جاهد يجاهد جهادا ومجاهدة অর্থাৎ সে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ও তাকে প্রতিহত করতে শক্তি, সামর্থ্য ব্যয় করেছে।[4]

মোটকথা আল্লাহ্ দ্বীনকে সমুন্নত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য জান, মাল, যবান ও শক্তি-সামর্থ্য দিয়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোই হচ্ছে জিহাদ।[5]

'জিহাদ' (جِهَاد) অর্থ প্রাণান্ত চেষ্টা করা। শরীআতের দৃষ্টিতে এর অর্থ দুইভাবে হয়ে থাকে: (১) 'আম' (عَامّ) বা ব্যাপক: এ অর্থে ইসলামের বিধিবিধান অনুযায়ী আমল করা, এদিকে মানুষকে দাওয়াত দেওয়া, ইসলাম রক্ষার চেষ্টা করা, সম্ভবপর সব পথ অবলম্বন করে ইসলামকে শক্তিশালী করা ইত্যাদিকে জিহাদ বলে। (২) 'খাছ' (خَاصّ) বা বিশেষ: এ অর্থে কাফেরগোষ্ঠীর সাথে লড়াই-সংগ্রামকে জিহাদ বলে। জিহাদের উভয় অর্থই বিশুদ্ধ (দ্র. হাজ্জ, ৭-৮; আনকাবূত, ৬; আনফাল, ৩৯; বুখারী, হা/৩০০৪; মুসলিম, হা/২৫৪৯)।[6]

কুরআনে জিহাদ একটি বহুমাত্রিক ধারণা। **মক্কার পর্যায়ে** (খ্রিষ্টীয় ৬১০–৬২২ সাল), যখন রাসূল মুহাম্মদ (সা.) মক্কায় কুরআনের ওহি লাভ করছিলেন, তখন জিহাদের উপর গুরুত্ব ছিল অন্তর্দর্শনের দিকে, যার অভিব্যক্তি **সবর** (صبر) অর্থাৎ ধৈর্য, সহনশীলতা ও জীবনের পরীক্ষায় আত্মসংবরণ হিসেবে প্রতিভাত হয়। এ সময় মক্কার পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ অর্থে বোঝানো হয়েছে কুরআনের মাধ্যমে কথামূলক ও তর্কাত্মক প্রচেষ্টা — যেমন কুরআনের ২৫:৫২ আয়াতে বলা হয়েছে।

মদীনার পর্যায়ে (৬২২–৬৩২), কুরআনিক ওহির পরবর্তী পর্যায়ে, জিহাদ ধারণাটি একটি নতুন মাত্রা পায় — তা হলো **কিতাল** (قتال), অর্থাৎ আত্মরক্ষামূলক সশস্ত্র প্রতিরোধ। মক্কার মুশরিকদের নির্যাতন ও আক্রমণের জবাবে মুসলমানদের আত্মরক্ষার জন্য এই যুদ্ধ অনুমোদিত হয়।

১.২ কোরআন হাদিসের আলোকে জিহাদের মৌলিক ধারণা

ইসলামে জিহাদের গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম। জিহাদ ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়ার নাম (তিরমিযী, হা/২৬১৬, ছহীহ)। জিহাদ সর্বোৎকৃষ্ট আমল (বুখারী, হা/১৫২০)। একে পবিত্র

---

[4] ফিকহুস সুন্নাহ, ৩য় খণ্ড (বৈরুত। দারুল কুতুবিল আরাবী, ১৯৮৭ খৃঃ/১৪০৭ হিঃ), পৃঃ ৭।
[5] https://www.britannica.com/topic/jihad
[6] জিহাদ ও উগ্রবাদ এক নয় - https://al-itisam.com/article_details/3247

কুরআনে জাহান্নাম থেকে মুক্তকারী ব্যবসা হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে (ছফ, ১০-১৩)। মহান আল্লাহ মুজাহিদদের মর্যাদা অনেক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাদের জন্য বিশেষ ক্ষমা ও দয়ার ঘোষণা দিয়েছেন (নিসা, ৮৫-৫৬)। তিনি তাদের জন্য জান্নাতে ১০০টি মর্যাদার স্তর প্রস্তুত রেখেছেন, যার এক একটির ব্যবধান আসমান ও যমীনের দূরত্বের ন্যায় (বুখারী, হা/২৭৯০)। শহীদের রক্তের প্রথম ক্ষরণের সাথে সাথে তার পাপ ক্ষমা করা হয়, জান্নাতে তার বাসস্থান দেখানো হয়, কবরের আযাব থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়...(ইবনু মাজাহ, হা/২৭৯৯)। আল্লাহর রাস্তায় আহত ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তাজা রক্ত নিয়ে আসবে, যার বর্ণ হবে লাল, কিন্তু সুগন্ধি হবে মিসকে আম্বরের (বুখারী, হা/২৮০৩)। শহীদের রূহ সবুজ পাখির পেটে রক্ষিত থেকে জান্নাতের সর্বত্র ঘুরে বেড়ায় (মুসলিম, হা/১৮৮৭)। জিহাদ এতো গুরুত্বপূর্ণ যে, অন্যান্য নবী ও তাদের উম্মতের উপরও তা বিধিবদ্ধ ছিল (মায়েদা, ২০-২৬; আলে ইমরান, ১৪৬-১৪৭; নামল, ৩৬-৩৭)। জিহাদ এমন ইবাদত, যার তামান্না প্রতিটি মুমিন হৃদয়ে অবশ্যই থাকতে হবে, অন্যথা এক প্রকার মুনাফিক্বী নিয়ে মরতে হবে (মুসলিম, হা/১৯১০)। এগুলো জিহাদের গুরুত্ব ও মর্যাদার নমুনামাত্র। উল্লেখ্য, ইসলামে জিহাদ মূল লক্ষ্য নয়; বরং তা আল্লাহর কালিমা প্রতিষ্ঠা ও বুলন্দ করার মাধ্যম মাত্র (তওবা, ১৪-১৬)।

উপর্যুক্ত ব্যাপক অর্থে জিহাদ ফরযে আইন। কারণ একজন মুমিনকে প্রতিনিয়ত নিজের নাফস, শয়তান, যালেম, বিদআতী, ভ্রান্ত ফেরক্বা ও অপকর্মকারীর বিরুদ্ধে, কাফের এবং মুনাফিক ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে জিহাদ করে যেতে হচ্ছে। কিন্তু বিশেষ অর্থে অর্থাৎ কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের হুকুম হচ্ছে, তা ফরযে কিফায়াহ (فَرْضُ كِفَايَةٍ); যে সংখ্যক মুজাহিদ অংশগ্রহণ করলে যথেষ্ট হবে, তারা জিহাদে গেলে হয়ে যাবে এবং বাকীদের আর গোনাহ হবে না। আর এটা সাধারণত আক্রমণাত্মক জিহাদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তবে ৪টি অবস্থায় জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়, যাতে অংশগ্রহণ করা সক্ষম প্রত্যেকটি মুসলিমের উপর ফরয: (ক) জিহাদে অংশগ্রহণ করে সক্ষমতা থাকা অবস্থায় সেখান থেকে পিছুটান দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই (আনফাল, ১৫-১৬)। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের ময়দান থেকে পালানোকে কাবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেছেন (বুখারী, হা/২৭৬৬; মুসলিম, হা/৮৯)। সুতরাং যে জিহাদের ময়দানে চলে গেছে, তার উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গেছে। (খ) শত্রু কর্তৃক যখন কোনো এলাকা ঘেরাও করা হবে, তখন সেই জনপদ রক্ষা করতে সক্ষম প্রত্যেক ব্যক্তির উপর জিহাদ করা ফরযে আইন হয়ে যাবে। এই ফরযে আইন সকল মুসলিমের জন্য নয়; বরং ঐ এলাকার ও আশপাশের মুসলিমদের জন্য। আর এটার আয়োজন ও ব্যবস্থাপনায় থাকবে সরকার। এটাকে রক্ষণাত্মক/আত্মরক্ষামূলক জিহাদ বলে। (গ) সরকার নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে জিহাদের

আদেশ করলে তার উপর জিহাদ করা ফরযে আইন হয়ে যায় (তওবা, ৩৮; বুখারী, হা/১৮৩৪; মুসলিম, হা/১৩৫৩)(ঘ) যখন জিহাদে কোনো ব্যক্তির প্রয়োজন পড়বে, যাকে ছাড়া সেই প্রয়োজন পূরণ করা সম্ভব নয়, তখন তার উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যাবে [দ্র. আশ-শারহুল মুমতে', ৮/৭-১২; ফাওযান, আল-জিহাদ: আল-মুলাখখাছুল ফিক্বহী, ১/৪৬১]।[7]

কুরআনে জিহাদ একটি বহুমাত্রিক ধারণা। **মক্কার পর্যায়ে** (খ্রিষ্টীয় ৬১০–৬২২ সাল), যখন রাসূল মুহাম্মদ (সা.) মক্কায় কুরআনের ওহি লাভ করছিলেন, তখন জিহাদের উপর গুরুত্ব ছিল অন্তর্দর্শনের দিকে, যার অভিব্যক্তি **সবর** (صبر) অর্থাৎ ধৈর্য, সহনশীলতা ও জীবনের পরীক্ষায় আত্মসংবরণ হিসেবে প্রতিভাত হয়। এ সময় মক্কার পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ অর্থে বোঝানো হয়েছে কুরআনের মাধ্যমে কথামূলক ও তর্কাত্মক প্রচেষ্টা — যেমন কুরআনের ২৫:৫২ আয়াতে বলা হয়েছে। **মদীনার পর্যায়ে** (৬২২–৬৩২), কুরআনিক ওহির পরবর্তী পর্যায়ে, জিহাদ ধারণাটি একটি নতুন মাত্রা পায় — তা হলো **কিতাল** (قتال), অর্থাৎ আত্মরক্ষামূলক সশস্ত্র প্রতিরোধ। মক্কার মুশরিকদের নির্যাতন ও আক্রমণের জবাবে মুসলমানদের আত্মরক্ষার জন্য এই যুদ্ধ অনুমোদিত হয়।[8]

১.৩ জিহাদের শ্রেণীবিভাগ

জিহাদের অনেক প্রকার রয়েছে। যথা- (১) অন্তর দ্বারা জিহাদ (২) যবানের মাধ্যমে জিহাদ বা দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে জিহাদ (৩) ধন-সম্পদ দ্বারা জিহাদ (৪) সশস্ত্র জিহাদ বা অস্ত্রের মাধ্যমে জিহাদ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বর্তমান সমাজে সশস্ত্র যুদ্ধই কেবল জিহাদ বলে পরিচিত। অথচ শক্তি প্রয়োগের পাশাপাশি মুখ ও অন্তর দ্বারা বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও অর্থ ব্যয় করাকেও জিহাদ নামে অভিহিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, جاهدوا المشركين بأموالكم .وأنفسكم وألسنتكم ، তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর তোমাদের ধন-সম্পদ দ্বারা, তোমাদের জীবন দ্বারা ও তোমাদের যবান দ্বারা'।[নাসাঈ, হা/৩০৯৬, হাদীছ ছহীহ; আবুদাউদ হা/২১৮৬; মিশকাত, হা/৩৮২১।]

তিনি মুমিনের পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে জিহাদের কয়েকটি পর্যায় উল্লেখ করেছেন। فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. জিহাদ করবে সে মুমিন, যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে কথা দ্বারা জিহাদ

7 জিহাদ ও উগ্রবাদ এক নয় - https://al-itisam.com/article_details/3247

8 https://www.britannica.com/topic/jihad

করবে সে মুমিন, যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে অন্তর দ্বারা জিহাদ করবে সে মুমিন। এরপরে সরিষা দানা পরিমাণও ঈমান নেই'।[9]

(১) অন্তর দ্বারা জিহাদ: কোন গর্হিত কাজ শক্তি বা বল প্রয়োগে প্রতিহত করা সম্ভব না হলে মনে মনে তা ঘৃণা করা হচ্ছে অন্তর দ্বারা জিহাদ।" [ফাতহুল বারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فيقلبه وذلك أضعف الإيمان. 'যদি তোমাদের কেউ কোন গর্হিত কাজ সংঘটিত হতে দেখে, তাহলে সে তা হাত দ্বারা প্রতিহত করবে। হাত দ্বারা প্রতিহত করা সম্ভব না হলে যবান দ্বারা প্রতিহত করবে। তাও সম্ভব না হলে অন্তরে ঘৃণা করবে। আর এটা হচ্ছে দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক'।[10]

(২) যবানের দ্বারা জিহাদ বা দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে জিহাদ: প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও ক্ষমতাধর, প্রভাবশালী ব্যক্তির সামনে হক্ক কথা বলা হচ্ছে যবানের মাধ্যমে জিহাদ। যেমন ইবরাহীম (আঃ) অত্যাচারী শাসক নমরূদের সাথে এবং নূহ (আঃ) তাঁর কওমের সাথে করেছিলেন। কুরআনুল কারীমে এসেছে নূহ (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে বলেন, 'তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। আমি তোমাদের জন্য একটি মহাদিবসের শাস্তির আশঙ্কা করি। তার সম্প্রদায়ের সর্দাররা বলল, আমরা তোমাকে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার মাঝে দেখতে পাচ্ছি। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি কখনো ভ্রান্ত নই, কিন্তু আমি বিশ্বপ্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল। আমি তোমাদেরকে প্রতিপালকের পয়গাম পৌছাই এবং তোমাদেরকে সদুপদেশ দেই। আমি আল্লাহ্ পক্ষ থেকে এমন সব বিষয় জানি, যেগুলো তোমরা জান না' (আরাফ ৫৯-৬২)।

শরী'আতের সুস্পষ্ট প্রমাণাদির দ্বারা মুনাফিকদের সাথে বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে যুদ্ধ করা। এটা যবান দ্বারা জিহাদ করার একটা প্রকারও বটে। এ প্রকার জিহাদের ব্যাপারে আল্লাহ গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেন, وَجَادِلْهُم بالتي هي أَحْسَنُ 'আর তাদের সাথে বিতর্ক করুন উত্তম পন্থায়' (নাহল ১২৫)।

(৩) ধন-সম্পদ দ্বারা জিহাদ: বাতিল প্রতিহতকরণ ও হক্ক প্রতিষ্ঠায় অর্থ-সম্পদ কুরবানী করা হচ্ছে মালী জিহাদ বা ধন-সম্পদের মাধ্যমে জিহাদ। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানাদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের কথা বলে দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং

[9] মুসলিম, 'ঈমান' অধ্যায় হা/৫০(১৭৯); মিশকাত হা/১৫৭ 'ঈমান' অধ্যায়, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।

[10] মুসলিম, হাদীছ নং ৪৯ (১৭৭), 'ঈমান' অধ্যায়; আবুদাউদ, হাদীছ নং ১১৪০ ও ৪৩৪০; তিরমিযী, হাদীছ নং ২১৭৩; ইবনু মাজাহ, হাদীছ নং ৪০১৩; রিয়াযুছ ছালেহীন, হাদীছ নং ১৮৩

তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করবে। আর এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানতে' (ছফ ১০-১১)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর তোমাদের ধন-সম্পদ দ্বারা, তোমাদের জীবন দ্বারা ও তোমাদের যবান দ্বারা'।'[11]

(৪) অস্ত্রের মাধ্যমে জিহাদ: যুদ্ধক্ষেত্রে কাফির মুশরিকদের বিরুদ্ধে আঘাত ও পাল্টা আঘাতের মাধ্যমে জিহাদ করা। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَ اَعِدُّوۡا لَہُمۡ مَّا اسۡتَطَعۡتُمۡ مِّنۡ قُوَّۃٍ وَّ مِنۡ رِّبَاطِ الۡخَیۡلِ تُرۡہِبُوۡنَ بِہٖ عَدُوَّ اللّٰہِ وَ عَدُوَّکُمۡ "কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি-সামর্থ্যের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর" (আনফাল ৬০)।

সশস্ত্র জিহাদ হচ্ছে জিহাদের সর্বোচ্চ প্রকার। এরপর আর কোন প্রকার নেই। আল্লাহ্র বাণীতেই তা প্রমাণিত হয়। তিনি বলেন, 'আর তাদের সাথে লড়াই কর আল্লাহর রাস্তায়, যারা তোমাদের সাথে লড়াই করে। আর কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না' (বাক্বারাহ ১৯০)। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, وَ قٰتِلُوۡہُمۡ حَتّٰی لَا تَکُوۡنَ فِتۡنَۃٌ وَّ یَکُوۡنَ الدِّیۡنُ لِلّٰہِ ؕ فَاِنِ انۡتَہَوۡا فَلَا عُدۡوَانَ اِلَّا عَلَی الظّٰلِمِیۡنَ "আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর যে পর্যন্ত না ফিৎনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত হয়ে যায়, তাহলে কারো প্রতি জবরদস্তি নেই, কিন্তু যারা যালেম (তাদের ব্যাপার স্বতন্ত্র)' (বাক্বারাহ ১৯৩)। তিনি আরো বলেন, قَاتِلُوۡہُمۡ یُعَذِّبۡہُمُ اللّٰہُ بِاَیۡدِیۡکُمۡ وَ یُخۡزِہِمۡ وَ یَنۡصُرۡکُمۡ عَلَیۡہِمۡ وَ یَشۡفِ صُدُوۡرَ قَوۡمٍ مُّؤۡمِنِیۡنَ "তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর। আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন, আর তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয়ী করবেন এবং মু'মিনের অন্তরসমূহকে প্রশান্ত ও ঠান্ডা করবেন" (তওবা ১৪)। অন্যত্র তিনি আরো বলেন, 'তোমরা যুদ্ধ কর আহলে কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম মনে করে না এবং সত্য দ্বীন অনুসরণ করে না, তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিযিয়া প্রদান করে' (তওবা ২৯)।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, وَ قَاتِلُوا الۡمُشۡرِکِیۡنَ کَآفَّۃً کَمَا یُقَاتِلُوۡنَکُمۡ کَآفَّۃً ؕ وَ اعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰہَ مَعَ الۡمُتَّقِیۡنَ 'আর মুশরিকদের সাথে তোমরা সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ কর যেমন তারাও তোমাদের সাথে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। আর জেনে রেখো, আল্লাহ মুত্তাক্বীদের সাথে রয়েছেন' (তওবা ৩৬)। তিনি আরো বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের নিকটবর্তী কাফিরদের সাথে

[11] নাসাঈ, হা/৩০৯৬, হাদীছ ছহীহ; আবুদাউদ হা/২১৮৬; মিশকাত, হা/৩৮২১

যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক। আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাক্বীদের সাথে রয়েছেন' (তওবা ১২৩)।

১.৪ জিহাদের স্তরসমূহ

জিহাদের ৪টি স্তর রয়েছে। যথা- ১. প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ ২. শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ ৩. মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ ৪. কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ।

১. প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ: কু-প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে মানুষ নানা রকম অন্যায়, অনাচার, অবিচার, যুলুম-অত্যাচার ও পাপকর্মের দিকে ধাবিত হয়। কু-প্রবৃত্তি বা পাশবিক শক্তি মানুষকে গর্হিত ও ইসলাম বিরোধী কাজে প্ররোচিত করে ও প্রেরণা যোগায় এবং ভাল কাজে তথা কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। জৈব উপাদানে পুষ্ট ও পাশবিক শক্তিতে বলীয়ান কু-প্রবৃত্তির ফলে মানুষের নৈতিক ও আত্মিক অবনতি ঘটে। মানুষের নৈতিক চরিত্রের অবনতি ঘটলে সে নানা প্রকার অন্যায়, অবিচার ও অশ্লীল কাজ করে বসে। এহেন জঘন্য অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য নফস বা কু-প্রবৃত্তি দমনের সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো অতীব যরূরী। আর এটাই হচ্ছে নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ। কু-প্রবৃত্তিকে দমন করে বা নিয়ন্ত্রণ করে তাকে আল্লাহ্র একান্ত অনুগত করা আবশ্যক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به 'তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ তার প্রবৃত্তি আমি যা নিয়ে এসেছি তার অনুসরণ না করবে'। [শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত, হাদীছ নং ১৬৭]

মানুষ এ কু-প্রবৃত্তিকে দমন করে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান মেনে চললে জান্নাত লাভ তার জন্য সহজতর হয়। মহান আল্লাহ বলেন, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. 'আর যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালক আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হওয়া সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত এবং নিজ আত্মাকে কু-প্রবৃত্তির হাত হতে রক্ষা করে তার স্থান অবশ্যই জান্নাত' (নাযি'আত ৪০-৪১)।

২. শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ: শয়তান মানব মনে যে সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি করে এবং অন্তরে যে কু-মন্ত্রণা দেয় তা প্রতিহত করাই হচ্ছে শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ। শয়তানের ধোঁকায় যাতে মানুষ পতিত না হয়, সেজন্য আল্লাহ তাকে সাবধান করেছেন। তিনি বলেন, 'হে মানুষ! নিশ্চয়ই আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে। শয়তান

তোমাদের শত্রু, অতএব তাকে শত্রুরূপেই গ্রহণ করো। সে তার দলবলকে আহ্বান করে যেন তারা জাহান্নামী হয়' (ফাতির ৫-৬)।

৩. মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ: মুনাফিকরা মুসলিমদের ছদ্মবেশ ধারণ করে ইসলামের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়ায়। তারা পোশাক-পরিচ্ছদে ও বাহ্যিক আমলের মাধ্যমে নিজেদেরকে মুসলিম হিসাবে উপস্থাপন করে। কিন্তু তাদের অন্তরে থাকে ইসলাম ধ্বংসের সুগভীর ষড়যন্ত্র। মূলতঃ যথার্থ দলীল-প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে তাদের প্রতিহত করা এবং পরিপূর্ণভাবে ইসলামের দিকে ফিরিয়ে আনা আবশ্যক। এটাই হচ্ছে মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ। এ জিহাদ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'হে নবী! তুমি কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের উপর কঠোর হও। তাদের আশ্রয়স্থল হচ্ছে জাহান্নাম। আর সেটা অতি নিকৃষ্ট আবাসস্থল' (তওবা ৭৩: তাহরীম ৯)। কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদের চেয়ে মুনাফিকদের সাথে জিহাদ অত্যন্ত কঠিন। কেননা কাফিরদের চেনা যায় ও তাদের শত্রুতা জানা যায়। কিন্তু মুনাফিকদের চেনা কষ্টসাধ্য এবং তাদের ষড়যন্ত্র অবগত হওয়াও দুরূহ।

৪. কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ: কাফিরদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য সকল প্রকার শক্তি দিয়ে জিহাদ করা। অর্থাৎ তাদের সাথে জান, মাল, যবান ও অন্তর দিয়ে জিহাদ করতে হবে। আল্লাহ বলেন, وَجَاهِدُوْا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ 'তোমরা আল্লাহ্র জন্য জিহাদ কর, যেমন জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে পছন্দ করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি' (হজ্জ ৭৮)। আল্লাহ আরো বলেন, وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهادًا كبيرًا 'আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক জনপদে একজন ভয় প্রদর্শনকারী প্রেরণ করতে পারতাম। অতএব আপনি কাফেরদের আনুগত্য করবেন না এবং তাদের সাথে এর সাহায্যে কঠোর সংগ্রাম করুন' (ফুরক্বান ৫১-৫২)।[12]

১.৫ জিহাদের উদ্দেশ্য

ইসলামে জিহাদ স্রেফ আল্লাহর জন্য হয়ে থাকে, দুনিয়ার জন্য নয়। যদি নিয়তের মধ্যে খুলুছিয়াত না থাকে এবং ব্যক্তি স্বার্থ বা অন্য কোন দুনিয়াবী স্বার্থ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে আল্লাহ্র দরবারে সেটা জিহাদ হিসাবে কবুল হবে না। জিহাদের আরো কতিপয় উদ্দেশ্য রয়েছে। আমরা এখানে গুরুত্বপূর্ণ কিছু উদ্দেশ্য উল্লেখ করব ।

[12] জিহাদ ও জঙ্গীবাদ : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, পৃঃ ১৭-১৯

১. আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত করার জন্য ও তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য: আল্লাহ বলেন, ‘তিনি রাসূলকে সাহায্য করেন এমন বাহিনী দ্বারা, যাদেরকে তোমরা দেখোনি এবং তিনি কাফিরদের ঝাণ্ডাকে অবনমিত করেন ও আল্লাহ্ ঝাণ্ডাকে সমুন্নত করেন’ (তাওবা ৪০)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, ‘যে ব্যক্তি লড়াই করে এজন্য যে, আল্লাহ্ কালেমা সমুন্নত হৌক, সে ব্যক্তিই কেবল আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধ করে’।[13]

আল্লাহ বলেন, هُوَ الَّذِيٓ اَرۡسَلَ رَسُوۡلَهٗ بِالۡهُدٰى وَ دِيۡنِ الۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهٗ عَلَى الدِّيۡنِ كُلِّهٖ وَ لَوۡ كَرِهَ الۡمُشۡرِكُوۡنَ ‘তিনিই সেই সত্তা যিনি স্বীয় রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন, যাতে তাকে সকল দ্বীনের উপরে তিনি বিজয়ী করতে পারেন। যদিও মুশরিকগণ এটা পসন্দ করে না’ (ছফ ৯)।

আল্লাহ্র কলেমাকে সমুন্নত করা ও আল্লাহ্ দ্বীনকে সমাজে প্রচলিত অন্যান্য দ্বীনসমূহের উপরে বিজয়ী করার বিষয়টি শুধুমাত্র সামরিক বা রাজনৈতিক বিজয়ের মাধ্যমে সম্ভব নয়। বরং এর জন্য প্রয়োজন জনগণের আক্বীদা ও আমলের সংস্কারের মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী বিজয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার যথাযথ বাস্তবায়ন। সামরিক ও রাজনৈতিক বিজয়ের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখা এবং শাসন ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য যেমন প্রয়োজনে সশস্ত্র যুদ্ধ করা যরূরী, তেমনি শান্তির অবস্থায় কথা,কলম ও সংগঠনের মাধ্যমে বাতিলের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ যুদ্ধ অব্যাহত রাখা যরূরী।

১৯০ বছরের ইংরেজ শাসন যেমন এদেশের মানুষকে খৃষ্টান বানাতে পারেনি, তেমনি প্রায় ৬৫০ বছরের মুসলিম শাসন ভারতবর্ষকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে পরিণত করতে পারেনি। কেননা অস্ত্র, অর্থ ও ক্ষমতা কখনোই স্থায়ী হয় না এবং তা কখনোই মানুষের হৃদয়ে স্থায়ী রেখাপাত করে না। কিন্তু আদর্শ বা দ্বীন মানুষের মধ্যে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে থাকে। যা শত শত বছর ধরে বজায় থাকে। তাই অন্যান্য দ্বীনের উপরে ইসলামকে বিজয়ী করতে গেলে সাময়িক সশস্ত্র যুদ্ধ বা রাজনৈতিক বিজয়ের মাধ্যমে সম্ভব নয় । এর জন্য চাই চিন্তা, যুক্তি, বিজ্ঞান সবকিছু দিয়ে অন্য দ্বীনকে পরাভূত করা।নবীগণ সকল যুগে মূলতঃ এ দায়িত্বই পালন করে গিয়েছেন।

---

[13] মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৮১৪ 'জিহাদ' অধ্যায়

অতএব আল্লাহ্ কালেমাকে সমুন্নত করার জন্য প্রয়োজন মুহূর্তে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা যেমন ‘জিহাদ’, মুখের ভাষা ও লেখনীর মাধ্যমে ও নিরন্তর সাংগঠনিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানুষের চিন্তা-চেতনা ও আমল-আচরণে পরিবর্তন আনাও তেমনি ‘জিহাদ’।

কেননা অন্যান্যদের ন্যায় দুনিয়াবী স্বার্থে যুদ্ধ-বিগ্রহকে ইসলাম কখনোই সমর্থন করেনি। বরং ইসলামী জিহাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হ’ল ‘মানবতার কল্যাণ সাধন ও আল্লাহ্ সন্তুষ্টি অর্জন’। আর এজন্য সর্বতোভাবে শক্তি অর্জন করা যরূরী। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রে বসবাস করেও যারা অনৈসলামী আইনে শাসিত হচ্ছেন, তারা নিজ রাষ্ট্রে ইসলামী আইন ও শাসন জারির পক্ষে জনমত সংগঠন করবেন ও সবশেষে তা পরিবর্তনের জন্য ইসলামী পন্থায় চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালাবেন। আর যারা অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রে বসবাস করেন, তারা ইসলামের সুমহান আদর্শ প্রচার করবেন এবং বাতিলের বিরুদ্ধে সাধ্যমত আপোষহীন থাকবেন। যেভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কী জীবনে বাস করেছিলেন।[14]

২. কাফিরদের ভীতি প্রদর্শন ও তাদের বিরোধিতা প্রতিহত করা: দ্বীন ইসলামকে শক্তিশালী করা, দ্বীন বিরোধীদের ও শত্রুদের শত্রুতা প্রতিহত করা এবং কাফিরদের সকল ষড়যন্ত্র ও বিরোধিতা প্রতিরোধ করতেই জিহাদের বিধান প্রবর্তিত হয়েছে।[ড. ওয়াহবাতুয যুহাইলী, আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, ৬ষ্ঠ খণ্ড (দামেশক: দারুল ফিকর, ১৯৮১ খৃঃ), পৃঃ ৯০।]

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, وَ قٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّ يَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ؕ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ‘আর তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যে পর্যন্ত না ফিতনা খতম হয়ে যায় এবং দীন আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। সুতরাং তারা যদি বিরত হয়, তাহলে যালিমরা ছাড়া (কারো উপর) কোন কঠোরতা নেই’ (বাক্বারাহ ১৯৩)। আল্লাহ আরো বলেন, ‘যখন ফেরেশতাদেরকে তোমাদের পরওয়ারদেগার নির্দেশ দান করেন যে, আমি তোমাদের সাথে রয়েছি, সুতরাং তোমরা মুসলমানদের চিত্ত সমূহকে ধীরস্থির করে রাখ। আমি কাফেরদের মনে ভীতি সঞ্চার করে দেব। কাজেই গর্দানের উপর আঘাত হান এবং তাদেরকে মার জোড়ায় জোড়ায়’ (আনফাল ১২)। অন্যত্র তিনি আরো বলেন, ‘আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যা কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি-সামর্থ্যের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহ্র শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর’ (আনফাল ৬০)।

[14] মাসিক আত-তাহরীক, ডিসেম্বর ২০০১, ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ১১

২. ইক্বামতে দ্বীন বা দ্বীন প্রতিষ্ঠা: ইসলামকে সকল ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত করার সার্বিক ব্যবস্থা করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, هُوَ الَّذِىٓ اَرۡسَلَ رَسُوۡلَهٗ بِالۡهُدٰى وَ دِيۡنِ الۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهٗ عَلَى الدِّيۡنِ كُلِّهٖ ۙ وَ لَوۡ كَرِهَ الۡمُشۡرِكُوۡنَ 'তিনি তাঁর রসূলকে হিদায়াত আর সঠিক দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন যাবতীয় দ্বীনের উপর একে বিজয়ী করার জন্য যদিও মুশরিকগণ অপছন্দ করে।' (ছফ ৯; তওবা ৩৩)। অন্যত্র তিনি আরো বলেন, 'তিনিই তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে একে (ইসলাম) অন্য সমস্ত ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন। সত্য প্রতিষ্ঠাতারূপে আল্লাহই যথেষ্ট' (ফাতহ ২৮)।

ইক্বামতে দ্বীনের অর্থ: ইক্বামত অর্থ কায়েম করা, প্রতিষ্ঠা করা। আর দ্বীন অর্থ হচ্ছে তাওহীদ বা আল্লাহ্র একত্ব ও তাঁর আনুগত্য। সুতরাং ইক্বামতে দ্বীন অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্ একত্ব প্রতিষ্ঠা। কিন্তু বর্তমান যুগের কোন কোন মুফাসসির এই আয়াতটির ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা দিয়ে দ্বীন অর্থ 'হুকুমত' (রাষ্ট্রক্ষমতা) করেছেন। ইসলামী হুকুমত কায়েমের জন্য চেষ্টা করা প্রত্যেক তাওহীদবাদী মুসলমানের উপরে অপরিহার্য দায়িত্ব। আর সেটা হল ইক্বামতে দ্বীনের একটি অংশ মাত্র। একমাত্র ইক্বামতে দ্বীন নয়। কেননা পূর্ণাঙ্গ তাওহীদ প্রতিষ্ঠার অর্থই হল পূর্ণাঙ্গ ইক্বামতে দ্বীন। যার অর্থ জীবনের সকল দিক ও বিভাগে কেবলমাত্র আল্লাহ্র বিধান ও দাসত্বকে কবুল করা ও তা বাস্তবায়িত করা। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করাও মুমিনের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। যে দায়িত্ব পালন করতে সকল মুমিন বাধ্য।[15]

ইক্বামতে দ্বীন সম্পর্কে আল্লাহ্র নির্দেশ হচ্ছে, شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصَّى بِهِ نُوْحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ 'তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ তিনি দিয়েছিলেন নূহকে এবং যা আমরা প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি ও যার আদেশ দিয়েছিলাম আমরা ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীন কায়েম করো এবং দ্বীনের ব্যাপারে মতবিরোধ করো না' (শূরা ১৩)।

৩. হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ: হক্ব ও বাতিল তথা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ জিহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। হক্ব সর্বদা বিজয়ী হয় আর বাতিল পরাভূত হয়। কিন্তু কখনো যদি বাতিলের দ্বারা হক্ব পরাভূত হয়, তখনই পৃথিবীর স্বাভাবিক নিয়ম-নীতিতে বিঘ্ন ঘটে, বিপর্যস্ত হয় সামাজিক ব্যবস্থা। মহান আল্লাহ বলেন, 'সত্য যদি তাদের কাছে কামনা-বাসনার অনুসারী হত, তবে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এগুলোর মধ্যবর্তী সবকিছুই বিশৃংখল

[15] বিস্তারিত দ্র: মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ইক্বামতে দ্বীন: পথ ও পদ্ধতি, (রাজশাহী: হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪), পৃঃ ৩-১৩।

হয়ে পড়ত। বরং আমি তাদেরকে দান করেছি উপদেশ, কিন্তু তারা তাদের উপদেশ অনুধাবন করে না' (মুমিনূন ৭১)।

মূলতঃ বাতিল সর্বদা পরাভূত হয়েই থাকে। আল্লাহ আরো বলেন, وَ قُلۡ جَآءَ الۡحَقُّ وَ زَهَقَ الۡبَاطِلُ ؕ اِنَّ الۡبَاطِلَ كَانَ زَهُوۡقًا 'বলুন, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল' (বনী ইসরাঈল ৮১)। তিনি আরো বলেন, قُلۡ جَآءَ الۡحَقُّ وَ مَا يُبۡدِئُ الۡبَاطِلُ وَ مَا يُعِيۡدُ বল, 'সত্য এসেছে এবং বাতিল কিছু সৃষ্টি করতে পারে না, আর কিছু পুনরাবৃত্তিও করতে পারে না' (সাবা ৪৯)। তিনি আরো বলেন, لِيُحِقَّ الۡحَقَّ وَ يُبۡطِلَ الۡبَاطِلَ وَ لَوۡ كَرِهَ الۡمُجۡرِمُوۡنَ 'যাতে তিনি সত্যকে সত্য প্রমাণিত করেন এবং বাতিলকে বাতিল করেন, যদিও অপরাধীরা তা অপছন্দ করে' (আনফাল ৮)। তিনি আরো বলেন,وَ يَمۡحُ اللّٰهُ الۡبَاطِلَ وَ يُحِقُّ الۡحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ 'আল্লাহ মিথ্যাকে মিটিয়ে দেন এবং স্বীয় বাক্য দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন' (শূরা ২৪)।

৪. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের বাস্তবায়ন: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 'তথা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ' ইসলামের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটাই পৃথিবীতে আগত সকল নবী-রাসূলের দায়িত্ব ছিল। এটা মুসলিম উম্মাহর এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। এটা তাদের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যও বটে। মহান আল্লাহ বলেন, كُنۡتُمۡ خَيۡرَ اُمَّةٍ اُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تَاۡمُرُوۡنَ بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَ تَنۡهَوۡنَ عَنِ الۡمُنۡكَرِ وَ تُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ 'তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত,যাদেরকে মানুষের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করবে' (আলে ইমরান ১১০)। তিনি আরো বলেন, وَلۡتَكُنۡ مِّنۡكُمۡ اُمَّةٌ يَّدۡعُوۡنَ اِلَى الۡخَيۡرِ وَ يَاۡمُرُوۡنَ بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَ يَنۡهَوۡنَ عَنِ الۡمُنۡكَرِ ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الۡمُفۡلِحُوۡنَ 'তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল হোক, যারা কল্যাণের দিকে আহবান করে, সৎ কাজের আদেশ করে এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করে আর এরাই সফলকাম' (আলে ইমরান ১০৪)।

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা প্রদান সম্পর্কিত উম্মাতে মুসলিমার এ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তারা এমন লোক, যাদের আমি পৃথিবীতে শক্তি- সামর্থ্য দান করলে তারা ছালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, সৎকাজের আদেশ দিবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। আর প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহ্ এখতিয়ারভুক্ত' (হজ্জ ৪১)।

হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অসৎকাজ হতে নিষেধ করবে। নতুবা অনতিবিলম্বেই আল্লাহ তা'আলা নিজের পক্ষ হতে তোমাদের উপর আযাব প্রেরণ করবেন।

অতঃপর তোমরা (আযাব মুক্তির জন্য) তাঁর নিকট দো'আ করবে কিন্তু তোমাদের দো'আ কবুল করা হবে না'।(ছহীহ তিরমিযী, হাদীছ নং ২১৬৯: মিশকাত, হাদীছ নং ৫১৪০। বঙ্গানুবাদ মিশকাত, হাদীছ নং ৪৯১৩।)[16]

১.৬ জিহাদের শর্তাবলী

জিহাদ ইসলামের এক শাশ্বত বিধান, যা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। এ বিধান যে কেউ তার খেয়ালখুশী মত জারী বা বাস্তবায়ন করতে পারে না। বরং এর জন্য কতিপয় সুনির্দিষ্ট শর্ত রয়েছে। এই শর্তগুলো পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান না থাকলে জিহাদ বৈধ হবে না। নিম্নে শর্তগুলো উপস্থাপন করা হল- (১) মুসলিম শাসক বিদ্যমান থাকা, (২) পক্ষ-বিপক্ষ সুস্পষ্ট হওয়া, (৩) যথার্থ ও পর্যাপ্ত শক্তি-সামর্থ্য থাকা।[17]

১. মুসলিম শাসক বিদ্যমান থাকা : জিহাদ হতে হবে মুসলিম শাসকের অধীনে। যিনি দেশের শাসন ক্ষমতার অধিকারী হবেন, তিনি দ্বীন রক্ষা ও দেশ রক্ষার জন্য জিহাদ ঘোষণা করলে জনগণ তাতে অংশগ্রহণ করবে। রাষ্ট্র বা সরকার প্রধান জিহাদ করতে অনিচ্ছুক হলে তার দায়ভার জনগণের উপর বর্তাবে না। এর জন্য জনগণ দায়ী বা গোনাহগার হবে না। কিন্তু এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে জিহাদের ঘোষণা দিলে বা জিহাদ পরিচালনা করলে তা হবে জিহাদের নামে সন্ত্রাস।

জিহাদ কেবল সরকার প্রধানের অধীনে হতে হবে। এ মর্মে নিম্নোক্ত হাদীছটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة يقاتل من وراءه، ويتقى به فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان بذلك أجره "রাসূলুল্লাহ (ছা:) বলেছেন, 'সরকার প্রধান হচ্ছে ঢাল স্বরূপ। তাঁর পশ্চাতে (অধীনে) থেকে যুদ্ধ করতে হবে এবং তাঁর মাধ্যমেই আশ্রয়ের ব্যবস্থা নিতে হবে। তিনি যদি আল্লাহভীতির নির্দেশ দেন এবং ইনছাফ প্রতিষ্ঠা করেন, তাহলে এর দ্বারা তিনি ছওয়াব পাবেন'।[18]

---

[16] জিহাদ ও জঙ্গীবাদ : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, পৃঃ ১৯-২৩

[17] মানহাজুল জমঈয়ত লিদদাওয়াতে ওয়াত তাওজীহ (জমঈয়াতু এহয়াইত তুরাছ আল-ইসলামী, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৭ খৃঃ/১৪১৭ হিঃ), পৃঃ ৪৮-৫৩

[18] বুখারী, হাদীছ নং ২৯৫৭; মুসলিম, হাদীছ নং ১৮৩৫

তিনি আরো বলেন, لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا ‘এ বিজয়ের (মক্কা বিজয়ের) পর আর কোন হিজরত নেই। তবে জিহাদ ও নিয়ত রয়েছে। যখন তোমাদেরকে (যুদ্ধের জন্য) বের হওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হবে, তখন তোমরা বেরিয়ে পড়বে’।[19]

روي اللالكائي عن ابن أبي حاتم أنه قال سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين، وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار، وما يعتقدان من ذلك، فقالا أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم إلى أن قال فان الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل نبيـــه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مع أولى الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيئ.
‘আল্লামা লালকাঈ (রহঃ) ইবনু আবী হাতিম (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আমার পিতা ও আবু যুর’আহকে দ্বীনের মূলনীতি সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা’আতের অভিমত জিজ্ঞেস করেছিলাম। উত্তরে তাঁরা উভয়ে বললেন, আমরা মক্কা, মদীনা, ইরাক, সিরিয়া ও ইয়ামান সহ সকল শহরের ওলামায়ে কেরামকে এ মতের উপর পেয়েছি যে, আল্লাহ কর্তৃক তাঁর নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রেরণের সময় থেকে শুরু করে ক্বিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের নেতাদের (রাষ্ট্রপ্রধান বা তাঁর স্থলাভিষিক্ত ক্ষমতাসীন ব্যক্তির) সঙ্গে মিলেই জিহাদ অব্যাহত রাখতে হবে। এ জিহাদকে কোন কিছুই বিনষ্ট করতে পারবে না’।[20]

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহ্হাব (রহঃ) বলেন, ‘জিহাদের বিষয়টি রাষ্ট্রপ্রধানের উপর নির্ভরশীল। আর প্রজাদের জন্য আবশ্যক হল শাসক যে নির্দেশ দেন তা মান্য করা’।[21]

আবুল কাসেম আল-খারকী বলেন, ‘শত্রু এসে পড়লে কম-বেশী পরিমাণে যাই হোক না কেন জনগণের জন্য আবশ্যক হল শত্রুর মোকাবিলায় বের হয়ে পড়া। তবে তারা শাসকের অনুমতি ব্যতীত শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য বের হবে না’।[22]

আবুত ত্বাইয়্যেব মুহাম্মাদ ছিদ্দীকু হাসান খান কানুজী বলেন, الجهاد فرض واجب على الأمة، وأن وجوبه لم يسقط بموته صلى الله عليه وسلم وأن الإمام شرط في أدائه والقيام به. ‘উম্মাতে মুসলিমার উপর জিহাদ ফরয। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইন্তিকালে এ ফরয রহিত হয়নি। তবে এ জিহাদের বিধান পালন করতে শাসক হচ্ছেন শর্ত’।[23]

---

19 বুখারী, হাদীছ নং ১৮৩৪; মুসলিম, হাদীছ নং ১৪৮৮

20 মানহাজুল জমঈয়ত, পৃঃ ৪৯-৫০; ইসলামের দৃষ্টিতে চরমপন্থা, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস, পৃঃ ৭৫-৭৬

21 মুওয়াল্লাফাতুশ শায়খ, পৃঃ ৩৬০; মানহাজুল জমঈয়ত, পৃঃ ৫০, টীকা নং ১

22 মানহাজুল জমঈয়ত, পৃঃ ৫০, প্রাগুক্ত

23 আল-ইবরাতু মিম্মা জাআ ফিল গাযওয়া ওয়াশ শাহাদাতে ওয়াল হিজরাতে, পৃঃ ১৭৯

উল্লেখ্য, কোন ব্যক্তি স্বীয় জান-মাল, ইয্যত-আব্রু ও পরিবার-পরিজন রক্ষার্থে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। তবে আইনের আশ্রয় নেয়ার কোন সুযোগ থাকলে তা গ্রহণ করাই শ্রেয়। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ) বলেন, إذ كانوا يخافون على أنفسهم وذراريهم فلا بأس أن يقاتلوا من قبل أن يأذن الإمام، ولكن لا يقاتلون إذا لم يخافوا على أنفسهم وذراريهم إلا أن يأذن الإمام. 'জনগণ নিজ ও পরিবার-পরিজনের নিরাপত্তার আশংকা করলে শাসকের অনুমতি ব্যতীত শত্রুর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারে। কিন্তু নিজ ও পরিবার-পরিজনের জন্য কোন ভয়-ভীতি না থাকলে শাসকের অনুমতি ব্যতীত শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না'।[24]

২. পক্ষ-বিপক্ষ সুস্পষ্ট হওয়া: জিহাদ হয় অমুসলিম, কাফির, মুশরিকদের বিরুদ্ধে। এক্ষেত্রে মুসলিম অমুসলিম পক্ষ স্পষ্ট হতে হবে। পক্ষ-বিপক্ষ স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত জিহাদে অবতীর্ণ হওয়া যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শ ছিল প্রত্যুষে আক্রমণ করা এবং তিনি প্রতিপক্ষ সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে আক্রমণ করতেন না। নিম্নোক্ত হাদীছটি তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

'আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফজর উদয় হওয়ার পর আক্রমণ করতেন। প্রথমে তিনি আযানের অপেক্ষা করতেন। আযান শুনতে পেলে আক্রমণ করা হতে বিরত থাকতেন নতুবা আক্রমণ করতেন। [মুসলিম, হা/৮৪৭]

ইসলামের প্রাথমিক যুগে হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে মুসলমানদেরকে মক্কার কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হতে বিরত রাখা হয়েছিল এজন্য যে, তখন অনেক মুসলমান নিজের আক্বীদা-বিশ্বাস গোপন করে মক্কায় বসবাস করছিলেন। এমর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যদি (মক্কায়) কিছু সংখ্যক ঈমানদার পুরুষ ও নারী না থাকত, যাদেরকে তোমরা জানতে না, অর্থাৎ তাদের পিষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকত, অতঃপর তাদের কারণে তোমরা অজ্ঞাতসারে ক্ষতিগ্রস্ত হতে, তবে সবকিছু চুকিয়ে দেয়া হত। কিন্তু এজন্য তা করা হয়নি, যাতে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতে প্রবেশ করান। যদি তারা সরে যেত, তবে আমি অবশ্যই তাদের মধ্যে যারা কাফির তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিতাম' (ফাতাহ ২৫)।

৩. যথার্থ ও পর্যাপ্ত শক্তি-সামর্থ্য থাকা: প্রতিপক্ষ বিরোধী শক্তিকে প্রতিহত ও দমন করার মত যথেষ্ট শক্তি-সামর্থ্য সঞ্চয় না করা পর্যন্ত যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া বৈধ নয়। কেননা এ অবস্থা কেবল পরাজয় ও ধ্বংসই ডেকে আনে। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কায় অবস্থানকালীন সময়ে তাঁর উপর যুদ্ধের নির্দেশ আসেনি। এমনকি মদীনায় হিজরতের পরও যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয়ের

---

[24] মানহাজুল জমঈয়ত, পৃঃ ৫০, টীকা নং ১

জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, ‘আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যা কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি-সামর্থ্যের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহ্ শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর’ (আনফাল ৬০)।

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) বলেন, إن الأمر بقتال الطائفة الباغية مشروط بالقدرة والإمكان، إذ ليس قتالهم بأولى من قتال المشركين و الكفار، ومعلوم أن ذلك مشروط بالقدرة والإمكان، ويشهد لذلك أن الرسول أخبر بظلم الأمراء بعده وبغيهم ونهى عن قتالهم لأن ذلك غير مقدور، إذ مفسدته أعظم من مصلحته، كما نهى في أول الإسلام عن القتال كما في قوله تعالى : ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. ‘সীমালংঘনকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার বিষয়টি শক্তি ও সামর্থ্যের সাথে সম্পৃক্ত। কেননা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কাফির ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চেয়ে অধিক উত্তম নয়। আর এটা জ্ঞাত বিষয় যে, এ যুদ্ধ (কাফির, মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ) শক্তি ও সামর্থ্যের সাথে শর্তযুক্ত। এর প্রমাণ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর পরবর্তী যুগের আমীরগণের অত্যাচার ও সীমালংঘনের ব্যাপারে অবহিত করে গেছেন। কিন্তু তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছেন। কেননা এটি ক্ষমতা বহির্ভূত। এর অকল্যাণের ভয়াবহতা কল্যাণের চেয়ে অধিক ক্ষতিকর। এজন্য ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানদেরকে যুদ্ধ করতে নিষেধ করা হয়েছিল। যেমন আল্লাহ তা’আলা বলেন, ‘তুমি সে সব লোককে দেখনি, যাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তোমাদের নিজেদের হাতকে সংযত রাখ’ (নিসা ৭৭)।[25]

সুতরাং কেবল ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থে কিংবা রাজ্য বিস্তার ও পররাজ্য গ্রাসের মানসে জিহাদ ঘোষণা করা হলে তা জিহাদ হিসাবে গণ্য হবে না। বরং তা হবে সন্ত্রাস বা আগ্রাসন। পক্ষান্তরে কেউ ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্র অস্তিত্বের উপর আঘাত হানলে, ইসলামের অবমাননা করলে, মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলে মুসলমানরা নীতিগতভাবে তাদেরকে প্রতিহত করতে পারবে। তবে এক্ষেত্রে প্রথমে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিতে হবে। এতে অস্বীকৃতি জানালে ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করে জিযিয়া দিয়ে বসবাসের প্রস্তাব দিতে হবে। এই দু’টি প্রস্তাবের কোনটি গ্রহণ না করে শত্রুপক্ষ আক্রমণ করে বসলে, তাদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করে জিহাদ করা যাবে। তবে এ জিহাদের ঘোষণা দিবেন রাষ্ট্রপ্রধান বা শাসক। রাষ্ট্রপ্রধান ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী

[25] মানহাজুল জমঈয়ত, পৃঃ ৫৩

নিজেদের বীরত্ব প্রকাশ কিংবা গোষ্ঠীস্বার্থ উদ্ধারের জন্য জিহাদ ঘোষণা করলে তা বৈধ হবে না।[26]

শরীআতের দৃষ্টিতে এর অর্থ দুইভাবে হয়ে থাকে: (১) 'আম' (عَامّ) বা ব্যাপক: এ অর্থে ইসলামের বিধিবিধান অনুযায়ী আমল করা, এদিকে মানুষকে দাওয়াত দেওয়া, ইসলাম রক্ষার চেষ্টা করা, সম্ভবপর সব পথ অবলম্বন করে ইসলামকে শক্তিশালী করা ইত্যাদিকে জিহাদ বলে। (২) 'খাছ' (خَاصّ) বা বিশেষ: এ অর্থে কাফেরগোষ্ঠীর সাথে লড়াই-সংগ্রামকে জিহাদ বলে। জিহাদের উভয় অর্থই বিশুদ্ধ (দ্র. হাজ্জ, ৭-৮; আনকাবূত, ৬; আনফাল, ৩৯; বুখারী, হা/৩০০৪; মুসলিম, হা/২৫৪৯)। প্রথম অর্থে জিহাদ কয়েক প্রকার হয়ে থাকে: (১) ব্যক্তির নিজের নাফসের বিরুদ্ধে জিহাদ (দ্র. হাজ্জ, ৭-৮; আনকাবূত, ৬)। (২) শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ। (৩) যালেম, বিদআতী, ভ্রান্ত ফেরক্বা ও অপকর্মকারীর বিরুদ্ধে জিহাদ। (৪) কাফেরের বিরুদ্ধে জিহাদ এবং (৫) মুনাফিক ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদ। দ্বিতীয় অর্থে জিহাদ দুই প্রকার: (১) আক্রমণাত্মক (Offensive/جِهَادُ الطَّلَبِ) জিহাদ ও (২) রক্ষণাত্মক/আত্মরক্ষামূলক (Defensive/جِهَادُ الدَّفْعِ) জিহাদ। জিহাদের এসবগুলো প্রকারই ইসলামে বলবৎ রয়েছে। কেউ কেউ বলতে চান, ইসলামে জিহাদ শুধু আত্মরক্ষামূলক; কিন্তু তাদের একথা মোটেও ঠিক নয়।[27]

জিহাদ বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। এর মধ্যে কিছু জিহাদ প্রত্যেক বালিগ ও প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিমের ওপর **ফরজ 'আইন** (ব্যক্তিগতভাবে আবশ্যক), কিছু জিহাদ **ফরজ কিফায়া** (সমষ্টিগত দায়িত্ব) – অর্থাৎ কিছু মানুষ তা সম্পাদন করলে বাকিদের দায় মাফ হয়ে যায়, এবং কিছু জিহাদ মুস্তাহাব (সওয়াবের কাজ, কিন্তু অপরিহার্য নয়)। **জিহাদ আন-নাফস** (নিজের নফস বা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ) এবং **জিহাদ আশ-শায়তান** (শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ) প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ 'আইন।

মুনাফিক, কাফের এবং জুলুম ও বিদআতের নেতাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ফরজ কিফায়া, অর্থাৎ কিছু লোক তা সম্পাদন করলে বাকিদের দায়মুক্তি ঘটে। তবে কখনো কখনো কাফেরদের বিরুদ্ধে শারীরিক জিহাদ (অস্ত্র ধারণ করে যুদ্ধ) ব্যক্তিগতভাবে ফরজ 'আইন হয়ে যায়, যেমন নির্দিষ্ট কিছু পরিস্থিতিতে – যা নিচে ব্যাখ্যা করা হবে।

---

[26] জিহাদ ও জঙ্গীবাদ : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, পৃঃ ২৩-২৭

[27] ফাতাওয়া ইবনে বায, ১৮/১৩৮

ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: জিহাদ প্রধানত চার প্রকার: ১. নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ, ২. শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ, ৩. কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ, ৪. মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ

নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ চারটি পর্যায়ে বিভক্ত:

১. ইসলামের জ্ঞান অর্জনে চেষ্টা করা। কারণ এ জ্ঞান ছাড়া দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা সম্ভব নয়।

২. প্রাপ্ত জ্ঞানের ওপর আমল করা। শুধুমাত্র জানা, কিন্তু আমল না করা ফলপ্রসূ নয়।

৩. অজ্ঞদের ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া। যে ব্যক্তি শিক্ষা গোপন করে, আল্লাহর শাস্তি থেকে সে মুক্ত নয়।

৪. আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়ার সময় যে কষ্ট ও অপমান আসে, তা ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করা।

যে ব্যক্তি উপরোক্ত চারটি স্তরে উত্তীর্ণ হবে, সে রাব্বানিয়্যীনদের অন্তর্ভুক্ত হবে। সালাফদের মতে, সত্যিকার আলেম সেই, যে জ্ঞান অর্জন করে, তা অনুযায়ী আমল করে এবং অন্যদের শিক্ষা দেয়।

শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ দুইটি ভাগে বিভক্ত:

১. শয়তান যে সংশয় সৃষ্টি করে, তা প্রতিহত করা।

২. শয়তান যে কু-প্রবৃত্তির দিকে আহ্বান করে, তা প্রতিহত করা।

প্রথম ধাপে মানুষের ঈমান দৃঢ় হয়, দ্বিতীয় ধাপে ধৈর্য বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ বলেন: “আর আমি তাদের মধ্য থেকে এমন কিছু নেতাকে তৈরি করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশে পথ প্রদর্শন করত, যখন তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল এবং তারা আমার নিদর্শনের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখত।” [সূরা আস-সাজদাহ, ৩২:২৪] অতএব, দ্বীনী নেতৃত্ব আসে ধৈর্য ও দৃঢ় বিশ্বাসের মাধ্যমে।

কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ চারটি উপায়ে হতে পারে:

১. হৃদয়ের মাধ্যমে,

২. জিহ্বার মাধ্যমে,

৩. সম্পদের মাধ্যমে,

৪. নিজের শরীর দ্বারা। কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ মূলত অস্ত্রধারণের মাধ্যমে, আর মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ চিন্তা ও বক্তব্যের মাধ্যমে।

যুলুম ও বিদআতের নেতাদের বিরুদ্ধে জিহাদ তিনভাবে হতে পারে:

১. হাতে (অর্থাৎ শারীরিকভাবে) – যদি তা সম্ভব হয়

২. জিহ্বার মাধ্যমে – যদি হাতে সম্ভব না হয়

৩. হৃদয়ে ঘৃণা করে – যদি বাকিও সম্ভব না হয়

এগুলোকে মিলিয়ে মোট **১৩** প্রকারের জিহাদ। এবং রাসূল (সা.) বলেন: "যে ব্যক্তি যুদ্ধ করেনি কিংবা যুদ্ধ করার ইচ্ছাও পোষণ করেনি, সে মুনাফিকদের একটি শাখার ওপর মৃত্যু বরণ করে।" [মুসলিম, হাদীস: **১৯১০**] শাইখ ইবন বায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: জিহাদ বিভিন্ন রকমের হতে পারে – নিজের দ্বারা, সম্পদ দ্বারা, দুআ দ্বারা, শিক্ষা প্রদান ও দাওয়াহ দ্বারা, ভাল কাজে সহযোগিতার মাধ্যমে। তবে সর্বোচ্চ স্তরের জিহাদ হলো নিজের শরীর দ্বারা (অর্থাৎ সরাসরি যুদ্ধ করা)।[28]

দ্বিতীয়তঃ কাফেরদের বিরুদ্ধে শারীরিক জিহাদ একাধিক পর্যায় অতিক্রম করেছে। ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, "প্রথমে রাসূল (সা.)-কে আল্লাহ শুধু কুরআন পাঠ করার নির্দেশ দেন — "اِقْرَأْ"। তখনো তিনি দাওয়াত দেওয়ার দায়িত্ব পাননি। এরপর নাজিল হয়: "হে চাদর মুড়ি দেওয়া! উঠে দাঁড়াও ও সতর্ক করো" (সূরা মুদ্দাসসির, ৭৪:১-২)

এরপর তিনি আত্মীয়দের সতর্ক করতে শুরু করলেন → কুরাইশ → আরববাসী → পুরো মানবজাতি। প্রথম দশ বছর তিনি শুধু দাওয়াত দেন, কোনো যুদ্ধ বা জিজিয়া আরোপের অনুমতি ছিল না। পরবর্তীতে মদীনায় হিজরত করার পর যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয় → শত্রুর আক্রমণের জবাবে যুদ্ধ করার নির্দেশ আসে → অবশেষে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে যুদ্ধ ফরজ হয়।

তৃতীয়তঃ কাফেরদের বিরুদ্ধে শারীরিক জিহাদ ফরজ কিফায়া। ইবন কুদামাহ (রহ.) বলেন: "জিহাদ সমষ্টিগত ফরজ; কিছু লোক পালন করলে বাকিদের দায় কেটে যায়। না করলে সবাই গুনাহগার।" (আল-মুগনী, ৯/১৬৩) শাইখ ইবন বায বলেন: "যদি কোনো স্থান থেকে যুদ্ধ শুরু হয়, আশেপাশের মুসলিম দেশগুলোকে সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে। যদি কয়েকটি

[28] ফাতাওয়া শাইখ ইবন বায, ৭/৩৩৪-৩৩৫

রাষ্ট্র যথেষ্ট অংশগ্রহণ করে, বাকিরা দায়মুক্ত হবে। কিন্তু কেউই অংশ না নিলে সবাই গুনাহগার।"[29]

চতুর্থতঃ কাফেরদের বিরুদ্ধে শারীরিক জিহাদ চারটি ক্ষেত্রে ফরজ 'আইন (ব্যক্তিগতভাবে ফরজ) হয়ে যায়:

১. যখন মুসলিম নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকে

২. যখন শত্রু মুসলিম এলাকা আক্রমণ করে

৩. যখন রাষ্ট্রপ্রধান সামরিক অভিযানে জনগণকে আহ্বান করেন

৪. যখন এমন কেউ প্রয়োজন, যাকে ছাড়া কাজ চলবে না

শাইখ ইবন উসাইমীন বলেন, 'যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ব্যক্তির পক্ষে পিছু হটা হারাম, কারণ কুরআনে বলা হয়েছে: "যখন তোমরা কাফেরদের মুখোমুখি হও, তখন পিছু ফিরে যেয়ো না।" (সূরা আনফাল, ৮:১৬) রাসূল (সা.) পিছু হটার বিষয়কে কবিরা গুনাহ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তবে দুটি ব্যতিক্রম রয়েছে:

১. কৌশলগত কারণে পিছু হটা

২. অপর দলকে সাহায্য করতে যাওয়া (যদি এতে নিজের দলের ক্ষতি না হয়)[30]

"Britannica"-র মতে, পরবর্তী ইসলামী সাহিত্য—বিশেষত হাদীস, তাফসীর ও সুফি ধারার লেখায়—জিহাদের এই দুই মাত্রা (সবর ও কিতাল) কে উন্নীত করা হয় দুটি ভিন্ন পরিভাষায়:

১. জিহাদ আল-নফস (جهاد النفس): আত্মিক ও নৈতিক সংগ্রাম, নিজ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে,

২. জিহাদ আল-সাইফ (جهاد السيف): অস্ত্রের মাধ্যমে শারীরিক যুদ্ধ।

এগুলোকে যথাক্রমে **আল-জিহাদ আল-আকবর** (বৃহত্তর জিহাদ) ও **আল-জিহাদ আল-আসগর** (ক্ষুদ্রতর জিহাদ) হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়েছে। এই প্রকারান্তরে, **আল্লাহর পথে প্রচেষ্টা** (জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ) ধারণাটির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে চারটি প্রধান উপায়ে:

১. **হৃদয় দ্বারা** (ন্যায়ের প্রতি অনুরাগ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণা)

২. **জিহ্বা দ্বারা** (সত্যের প্রচার ও মিথ্যার প্রতিবাদ)

[29] ফাতাওয়া, ৭/৩৩৫

[30] Ruling on jihad and kinds of jihad - https://islamqa.info/en/answers/20214/ruling-on-jihad-and-kinds-of-jihad

৩. **হাত দ্বারা** (অস্ত্র ছাড়া শারীরিক হস্তক্ষেপ)

৪. **তলোয়ার দ্বারা** (সশস্ত্র সংগ্রাম)[31]

১.৭ জিহাদের আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক দিকগুলো

ইসলামে 'জিহাদ' একটি বহুমাত্রিক ও গভীর জীবনদর্শন, যা শুধু যুদ্ধ বা লড়াইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এটি একজন মুসলমানের আত্মার পরিশুদ্ধি থেকে শুরু করে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বিস্তৃত এক ধারাবাহিক প্রয়াস। ইসলামী স্কলাররা জিহাদকে প্রধানত দুইটি দিক থেকে বিশ্লেষণ করেছেন—**আধ্যাত্মিক (spiritual)** এবং **বৈষয়িক বা বাহ্যিক (physical/material)**। এই দুইটি দিক একে অপরের পরিপূরক, এবং ইসলামের নৈতিক কাঠামোকে পূর্ণতা দেয়।

১. আধ্যাত্মিক দিক: জিহাদের প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো আধ্যাত্মিক সংগ্রাম, যা মূলত নিজের ভেতরের খারাপ প্রবৃত্তি, শয়তানের ফুসলানি, লোভ, রাগ, হিংসা, অহংকার ইত্যাদির বিরুদ্ধে ধারাবাহিক প্রচেষ্টাকে বোঝায়। ইসলাম মতে, ব্যক্তিগত নৈতিক উন্নতির জন্য একজন মুমিনকে নিজের নফসের (আত্মা) বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়। এ দিককে বলা হয় **"আল-জিহাদ আল-আকবর"** (বৃহত্তম জিহাদ)।

ইমাম গাযজালী বলেন: "নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এমন এক জিহাদ যা কখনো শেষ হয় না। কারণ এটি সেই যুদ্ধ যা অন্তরের গভীরে চলে, আর এর বিজয়ী হল সেই ব্যক্তি যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।"[32] এই দিকটি ইসলামি নৈতিকতার ভিত্তি গড়ে তোলে। কুরআনে এর ইঙ্গিত রয়েছে, "যারা আমাদের পথে জিহাদ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব।" (সূরা আনকাবুত, ২৯:৬৯) এখানে 'আমাদের পথে জিহাদ' বলতে আত্মিক সাধনা, সত্য ও ধৈর্যপূর্ণ জীবনের সংগ্রামকে বোঝানো হয়েছে।

বিখ্যাত হাদীসে এসেছে, "আমরা ছোট জিহাদ (অস্ত্রধারী যুদ্ধ) থেকে ফিরে এসেছি, এখন বড় জিহাদ (নিজের নফসের বিরুদ্ধে লড়াই) শুরু।" *(বায়হাকী, আল-যুহদ, হাদীস ৩৮২)* এই দিকটাই একজন মানুষকে মুমিনে পরিণত করে, যিনি নিজের চিন্তা, কথাবার্তা ও কাজকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য শুদ্ধ করতে চান।

---

[31] https://www.britannica.com/topic/jihad

[32] Imam al-Ghazali, Ihya Ulum al-Din

২. বৈষয়িক বা বাহ্যিক দিক: জিহাদের দ্বিতীয় দিক হলো বাহ্যিক বা সামাজিক সংগ্রাম। এটি এমন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ হয়, যখন মুসলিম সমাজ বা ব্যক্তি অন্যায়, জুলুম, দমন-পীড়ন, শত্রু হামলা কিংবা ধর্মীয় নিপীড়নের মুখোমুখি হয়। তখন কেবল অস্ত্রধারণ নয়, বরং কলম, ভাষণ, শিক্ষা, দাওয়াত, অর্থ ও সংগঠিত প্রতিরোধ সবই বৈধ ও আবশ্যিক জিহাদের অংশ হয়ে পড়ে।

আল্লাহ বলেন: "আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে; কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।" *(সূরা আল-বাকারা, ২:১৯০)* এ আয়াতে পরিষ্কারভাবে যুদ্ধের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। যুদ্ধ হবে আত্মরক্ষার জন্য, সীমিত ও ন্যায়ভিত্তিক। নিরীহ মানুষ, নারী, শিশু, বৃদ্ধ—তাদের আঘাত করা সম্পূর্ণ হারাম।

ইসলামি ইতিহাসে এই দিকের জিহাদের বহু উদাহরণ রয়েছে, যেমন—নবী করিম (সা.)-এর মদিনার সময়ে কুরাইশদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা, খলিফা উমরের (রা.) সময়ে বাইজান্টাইন ও পারস্য সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় প্রতিরোধ, এবং পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে মুসলিমদের বৈধ সংগ্রাম। এসব ক্ষেত্রে জিহাদ ছিল রাষ্ট্রীয় অনুমোদিত, ন্যায়ের ভিত্তিতে সংঘটিত এবং জনগণের রক্ষার্থে পরিচালিত।

সমসাময়িক পণ্ডিত ড. ইউসুফ আল-কারযাভি তার Fiqh al-Jihad গ্রন্থে বলেন- "জিহাদকে যদি শুধুই অস্ত্রের মাধ্যমে যুদ্ধ হিসেবে দেখা হয়, তবে এর পূর্ণতা নষ্ট হয়। কারণ ইসলামে জিহাদ মানে হচ্ছে সত্যের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান, তা মুখে হোক, কলমে হোক বা প্রয়োজনে হাতে।"[33]

আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক—এই দুই দিক একে অপরের পরিপূরক। যদি আত্মিক জিহাদ না থাকে, তবে বাহ্যিক জিহাদ ক্ষমতালোভী বা প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। আর যদি বাহ্যিক জিহাদ না থাকে, তবে জুলুমের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন: "আত্মশুদ্ধির জিহাদ ছাড়া বাহ্যিক জিহাদ সম্পূর্ণ হয় না, আর বাহ্যিক জিহাদ ছাড়া ধর্মের রক্ষা অসম্ভব।"[34]

[33] Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Jihad*, Cairo: Maktabat Wahbah, 2009

[34] Ibn Taymiyyah, Majmu' al-Fatawa

জিহাদ মানে কেবল অস্ত্রধারণ নয়, বরং ইসলামের আলোকে জিহাদ একটি ধারাবাহিক চেষ্টা—যা একজন মানুষকে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে নিয়ে যায় এবং সমাজে ন্যায় ও শান্তির ভিত্তি স্থাপন করে।

২. জিহাদের ইতিহাস : প্রাচীন থেকে আধুনিক যুগ

“Britannica”-র মতে, প্রাচীন ইসলামী ফিকহবিদগণ আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়নে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও ইসলামি ভূখণ্ড রক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেন। ফলে জিহাদকে তারা প্রাথমিকভাবে সামরিক দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করেন। যদিও কুরআন স্পষ্টভাবে যুদ্ধ শুরু করা নিষিদ্ধ করে (সূরা বাকারা ২:১৯০) এবং কেবল আক্রমণের জবাবে আত্মরক্ষার অনুমতি দেয় (সূরা আল-মুমতাহিনা ৬০:৭–৮; সূরা আন-নিসা ৪:৯০), তথাপি বহু প্রাক-আধুনিক ফকীহ রাজনৈতিক বাস্তবতা মেনে জিহাদের পরিধিকে সম্প্রসারিত করেন।

এমনকি অনেকে ইসলামের প্রতি অবিশ্বাসকেই একপ্রকার “আক্রমণাত্মক মনোভাব” হিসেবে গণ্য করে মুসলিম শাসকের জন্য সেই অবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধকে বৈধ মনে করেন। তবে আহলুল কিতাব তথা খ্রিষ্টান ও ইহুদি সম্প্রদায়, যাদের কুরআনে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, তারা মুসলিম শাসকের আশ্রয়ে থাকলে রক্ষা পেত এবং জিজিয়া নামক কর প্রদান করে ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীন থাকতে পারত। কেউ ইসলাম গ্রহণ না করলেও কর প্রদান করে সহাবস্থান করতে পারত। পরবর্তীকালে **অগ্নিপূজক (জরথুস্ট্রীয়), হিন্দু, বৌদ্ধ** প্রভৃতি সম্প্রদায়কেও আহলুল কিতাবের অনুরূপ “রক্ষিত সম্প্রদায়” হিসেবে গণ্য করা হয় এবং তাদের ওপরও অনুরূপ অধিকার ও দায়িত্ব আরোপ করা হয়।[35]

২.১ জিহাদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

ইসলামে ‘জিহাদ’ শব্দটির ইতিহাস ও প্রয়োগ এক দীর্ঘ ও গভীর পরম্পরার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে। এটি কেবল ধর্মীয় একটি নির্দেশ নয়, বরং মুসলিম সভ্যতার রাজনৈতিক, সামাজিক এবং নৈতিক অভিযাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। কুরআনের বিভিন্ন পর্ব, নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন, সাহাবিদের আন্দোলন এবং পরবর্তী খিলাফত ও রাজতান্ত্রিক ইতিহাসে জিহাদ বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ব্যবহৃত হয়েছে। এই ধারাবাহিক বিবর্তন জিহাদের প্রকৃত ব্যাখ্যা বোঝার জন্য অপরিহার্য।

২.১.১ মক্কী যুগে (৬১০–৬২২ খ্রি.): জিহাদের আধ্যাত্মিক সূচনা

জিহাদের ইতিহাস শুরু হয় নবুয়তের প্রথম যুগ থেকেই। মক্কা পর্বে মুসলিমরা ছিল সংখ্যায় অল্প এবং প্রতিনিয়ত নির্যাতনের শিকার। এই সময় কুরআন জোর দিয়েছিল আত্মিক ধৈর্য, সহনশীলতা ও আত্মশুদ্ধির সংগ্রাম–এর ওপর। যুদ্ধ বা প্রতিরোধের কোনো অনুমতি ছিল না।

[35] https://www.britannica.com/topic/jihad

বরং কুরআনে বলা হয়: "তুমি কুরআনের মাধ্যমে কাফিরদের বিরুদ্ধে বড় জিহাদ করো"(সূরা আল-ফুরকান ২৫:৫২)

এখানে যুদ্ধ নয়, বরং জ্ঞান ও দাওয়াহভিত্তিক সংগ্রামকে জিহাদ বলা হয়েছে। এটি ছিল 'জিহাদ আল-নাফস' বা আত্মার বিরুদ্ধে সংগ্রামের একটি যুগ।

২.১.২ মাদানী যুগে (৬২২–৬৩২ খ্রি.): আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতি

মদিনায় হিজরতের পর মুসলিম সমাজ রাষ্ট্রীয় কাঠামো লাভ করে। তখন কুরাইশরা সরাসরি আক্রমণ শুরু করলে মুসলিমদের আত্মরক্ষার অনুমতি দেওয়া হয়। কুরআনের প্রথম যুদ্ধ-সংক্রান্ত আয়াত নাজিল হয়, **"যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে, তাদের যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কারণ তাদের উপর জুলুম করা হয়েছে।"** *(সূরা হজ্জ ২২:৩৯)*

এরপর বদর, উহুদ ও খন্দকের মতো যুদ্ধগুলোতে মুসলিমরা আত্মরক্ষামূলক জিহাদে অংশ নেয়। নবী করিম (সা.) নিজে এসব যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন, তবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই যুদ্ধের নৈতিকতা ও সীমা কঠোরভাবে রক্ষা করা হয়—নারী, শিশু, অসহায় ও সাধারণ নাগরিকদের হত্যা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল।

২.১.৩ খিলাফত যুগে (৬৩২–৭৬১ খ্রি.): জিহাদের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ

খলিফা আবু বকর (রা.) থেকে শুরু করে উমর (রা.) ও উসমান (রা.)-এর শাসনামলে জিহাদ আরও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। বাইজান্টাইন ও পারস্য সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে জিহাদ ছিল রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে সংগঠিত এবং আত্মরক্ষামূলক (Peters, 1996)। তবে এই সময়ে জিহাদ শুধুমাত্র যুদ্ধ নয়; নতুন ভূমিতে দাওয়াহ, ইনসাফভিত্তিক প্রশাসন ও ট্যাক্স ব্যবস্থা চালুও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

২.১.৪ উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগ (৭৬১–১২৫৮ খ্রি.): সাম্রাজ্য বিস্তারে জিহাদের ব্যবহার

এই পর্বে জিহাদ মূলত রাজনৈতিক ও সাম্রাজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে থাকে। উমাইয়া খিলাফত ইসলামি শাসন বিস্তারের নামে বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধ চালায়। অনেক সময় এটিকে 'ধর্মীয় দায়িত্ব' বলা হলেও, রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের প্রবণতাও এতে লক্ষণীয় ছিল (Cook, 2005)। আব্বাসীয় যুগে জিহাদ ধীরে ধীরে দারুল ইসলাম বনাম দারুল হারব এর

ধারণায় গাঁথা হয়, যেখানে অমুসলিম ভূমিকে শত্রুপ্রধান অঞ্চলে পরিণত করা হতো, এবং মুসলিমদের কর্তব্য ছিল সেই এলাকা ইসলামী শাসনে আনা।

২.১.৫ উপনিবেশবিরোধী ও আধুনিক প্রতিরোধমূলক জিহাদ (১৮শ–২০শ শতক)

ব্রিটিশ, ফরাসি ও অন্যান্য উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের বহু প্রতিরোধ আন্দোলন জিহাদের ব্যানারে সংঘটিত হয়। ভারতবর্ষে শাহ ওয়ালিউল্লাহ, সিদ্দিক হাসান খান, আফ্রিকায় উসমান দান ফোদিও, সোমালিয়ায় সৈয়দ মুহাম্মদ হাসান প্রমুখ নেতারা রাজনৈতিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় জিহাদ ঘোষণা করেন। এই সময় জিহাদ ছিল আত্মনিয়ন্ত্রণ, স্বাধীনতা ও ইসলামী পরিচয় রক্ষার সংগ্রাম।

২.১.৬ আধুনিক যুগে জিহাদের সংকট ও চ্যালেঞ্জ

বর্তমানে, জিহাদ শব্দটি বিশ্ব রাজনীতিতে বহুল ব্যবহৃত ও বিকৃত একটি শব্দে পরিণত হয়েছে। 'War on Terror'-এর প্রেক্ষিতে মুসলিম সমাজ ও "জিহাদ" ধারণাকে প্রায়শই সহিংসতা ও উগ্রতার প্রতীক হিসেবে তুলে ধরা হয়।[36]

এর ফলে তরুণ প্রজন্ম বিভ্রান্ত হচ্ছে, একদিকে উগ্রবাদে জড়িয়ে পড়ছে, অন্যদিকে ইসলাম সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস হারাচ্ছে। সমসাময়িক ইসলামি চিন্তাবিদ ইউসুফ আল-কারযাভি, তারিক রামাদান ও খালেদ আবু আল-ফাদল এই অবস্থার প্রতিবাদ করে বলেন—জিহাদকে পুনরায় নৈতিক, আত্মিক ও সামাজিক চেতনার আলোকে ব্যাখ্যা করতে হবে। [37]

ইতিহাসে জিহাদ যেমন বিকৃত হয়েছে, তেমনি উদার ও নৈতিক কাঠামোতেও ব্যবহৃত হয়েছে। আজকের প্রেক্ষাপটে প্রয়োজন—জিহাদের এই বহুমাত্রিক ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে চিনে নেয়া এবং ইসলামি নীতিমালায় তার প্রকৃত অবস্থান বুঝে সমাজে প্রচার করা।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেছেন, "কুর'আন হাদীসে প্রচুর পরিমাণে জিহাদ ও জিহাদের ফজিলতের কথা বর্ণিত হয়েছে। তবে কোনটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত শরঈ জিহাদ আর কোনটি প্রবৃত্তি পূজারীদের ভুয়া যুদ্ধ, এই পার্থক্যজ্ঞানটুকু থাকা বাঞ্ছনীয়। কেউ কেউ শয়তানের পথে যুদ্ধ করেও ভাবে যে, তারা বুঝি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করছে

[36] Said, Covering Islam, 1981

[37] Al-Qaradawi, 2009; El Fadl, 2005

। যেমন খারেজী ও উগ্র ইসলামপন্থীরা। (আইএস, তালেবান, আলকায়েদাসহ বিশ্বের বিভিন্ন জঙ্গিগোষ্ঠীর জিহাদ-অনুবাদক)।[38]

জিহাদ করতে হলে মুসলামনদের কাছে লড়াইয়ের শক্তি সামর্থ্য থাকা জিহাদের একটি পূর্বশর্ত। সামর্থ্য অর্জন না করে জিহাদ করতে যাওয়া সম্পূর্ণ না জায়েয। কেননা এর ফলাফল হয় স্রেফ নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া। কারণ 'আল্লাহ কারো উপর সাধ্যাতীত কোন কিছু চাপিয়ে দেন না'। (বাকারা-৩৮৬)

মক্কী জীবনে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল সা. ও সাহাবায়ে কেরামকে জিহাদের নির্দেশ না দেওয়ার কারণটিও এখান থেকে সহজে অনুমান করা যায়। তখন শত্রুদের তুলনায় মুসলমানরা শক্তি ও উপকরণে বেশ দুর্বল ছিলো।

পিতামাতার সম্মতি জিহাদের আরেকটি শর্ত। কারণ, মাতাপিতার সেবা ফরজে আইন, পক্ষান্তরে জিহাদ হলো ফরজে কেফায়া। কেফায়া বনাম আইনের মোকাবেলায় আইনটাই অগ্রাধিকারযোগ্য। এমনকি পিতা-মাতার কোন একজন যদি অনুমতি দেয় আর অপরজন না দেয়, সেক্ষেত্রেও জিহাদে যাওয়া জায়েয হবে না। এরপরও তুমি যদি তথাকথিত জিহাদে যাও তাহলে পাপের ভাগিদার হওয়া ছাড়া গতি থাকবে না।

এক সাহাবী রাসূল সা. এর কাছে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে রাসূল সা. তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন 'বাবা মা বেঁচে আছেন'? 'হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ!' ছেলেটি উত্তর দিলো। রাসূল সা. বললেন, তুমি তাদের মাঝে থেকেই জিহাদ (সেবা) করো। এটি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বুখারীর বর্ণনা। আবু সাইদ রা. থেকে আবু দাউদ বর্ণিত বর্ণনাটি আরো স্পষ্ট। 'হে যুবক! তুমি ঘরে ফিরে যাও, তারা যদি অনুমতি দেন তবে জিহাদ করো, অন্যথায় তাদের সেবা করো'। (সুনানে আবূ দাঊদ- ২৫৩০)

২.২ প্রাথমিক যুগে জিহাদের ভূমিকা

ইসলামের প্রাথমিক যুগে জিহাদের ভূমিকা ছিল বহুমুখী এবং এর তাৎপর্য ঐতিহাসিক, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে মক্কা ও মদিনার সময়কালে, জিহাদের ভূমিকাও ছিল ভিন্ন। যেমন, মক্কায় ইসলামের প্রাথমিক দিনগুলোতে জিহাদ প্রধানত অহিংস

[38] আর রাদ্দূ আলাল ইখনায়ী-২০৫পৃ.

এবং আধ্যাত্মিক ছিল। এই সময়ে মুসলিমরা কুরাইশদের কাছ থেকে তীব্র নির্যাতনের শিকার হতেন। এমতাবস্থায় মুসলিমরা বিভিন্ন পন্থায় জিহাদে লিপ্ত হতেন-

১. মুসলিমররা ধৈর্য, সহনশীলতা এবং আল্লাহর উপর ভরসার মাধ্যমে নিজেদের ঈমানকে শক্তিশালী করতেন। কুরআনের সূরা আল-আনকাবুত (২৯:৬৯) এই ধরনের সংগ্রামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

২. রাসূল (সা.) এবং সাহাবীরা ইসলামের বাণী শান্তিপূর্ণভাবে প্রচার করতেন, যা এক প্রকারের জিহাদ, কারণ এটি প্রতিকূল পরিবেশে সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ছিল।

৩. মুসলিমরা নির্যাতনের মুখে সহ্য করতেন এবং প্রতিশোধ নেওয়ার পরিবর্তে ধৈর্য ধারণ করতেন। এই সময়ে সামরিক জিহাদের অনুমতি ছিল না।

রাসূলুল্লাহ (স) মদিনায় হিজরতের পর ইসলামী সম্প্রদায় একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো গড়ে তুলেছিল। মদিনায় হিজরতের পর জিহাদের রূপ পরিবর্তিত হয়। মুসলিমরা একটি সংঘবদ্ধ সমাজ গঠন করে এবং ইসলামের প্রতিরক্ষার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের অনুমতি পায়। কুরআনের সূরা আল-হজ্জ (২২:৩৯) এ বলা হয়, "যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে, তাদের যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হল, কারণ তারা নির্যাতিত।" বদর (৬২৪), উহুদ (৬২৫), এবং খন্দক (৬২৭) যুদ্ধ এই প্রতিরক্ষামূলক জিহাদের উদাহরণ। এই যুদ্ধগুলোর মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব রক্ষা, নৈতিকতা এবং ইসলামের প্রসার নিশ্চিত করা।

প্রাথমিক যুগে জিহাদের জন্য কঠোর নৈতিক নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয়। নারী, শিশু, বৃদ্ধ, এবং অযোদ্ধাদের উপর আক্রমণ নিষিদ্ধ ছিল। পরিবেশ ধ্বংস, ফসল নষ্ট করা, বা অপ্রয়োজনীয় সহিংসতা নিষিদ্ধ করা হয়। হুদাইবিয়ার সন্ধি (৬২৮) এবং মক্কা বিজয় (৬৩০) এই নৈতিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, যেখানে ক্ষমা ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

জিহাদ মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি করে। বিশেষ করে মদিনায় বিভিন্ন উপজাতি ও গোষ্ঠীকে একত্রিত করতে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জিহাদের মাধ্যমে ইসলাম আরব উপদ্বীপে দ্রুত প্রসারিত হয়। মক্কা বিজয়ের পর অনেক উপজাতি স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে। ন্যায়বিচার, ক্ষমা, এবং মানবিকতার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়, যা পরবর্তীতে ইসলামী সভ্যতার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

২.৩ মধ্যযুগে ক্রুসেড এবং ইসলাম সম্প্রসারণ এর প্রয়োগ

মধ্যযুগ (প্রায় ৫ম থেকে ১৫শ শতাব্দী) ছিল ধর্মীয় উৎসাহ এবং ভূ-রাজনৈতিক পরিবর্তনের একটি সময়। এই সময়ে খ্রিস্টান ক্রুসেড এবং ইসলামের সম্প্রসারণ বিশ্ব ইতিহাসে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। ক্রুসেড ছিল খ্রিস্টানদের পবিত্র ভূমি (জেরুজালেম এবং এর আশেপাশের অঞ্চল) পুনরুদ্ধারের জন্য সামরিক অভিযান, যখন ইসলামের সম্প্রসারণ মুসলিম শাসকদের দ্বারা বিশাল ভূখণ্ডের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ঘটেছিল। এই দুটি ঘটনা একে অপরের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছিল এবং মধ্যযুগীয় বিশ্বের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক গতিশীলতাকে প্রভাবিত করেছিল। ক্রুসেড যুদ্ধের মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্ব মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন ইউরোপীয় খৃস্টানগণ। ১ম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের পতন ও মুসলিম বিশ্বে উপনিবেশ স্থাপনের মাধ্যমে ক্রুসেডের সমাপ্তি হয়েছে বলে ধারণা করেছিলেন তারা। আসুন, ক্রুসেড সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিই।

২.৩.১ ক্রুসেড

ক্রুসেডের সূচনা হয়েছিল ১১শ শতাব্দীর শেষের দিকে, যখন খৃস্টজগতের মহামান্য পোপের আহ্বানে ইউরোপের খৃস্টান রাজ্যসমূহ জোটবদ্ধ হয়ে মধ্যপ্রাচ্যে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরূদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করে। বিশেষ করে সিরিয়া, ফিলিস্তীন ও মিশরে ১০৯৬- ১২৯২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় দুইশত বছর ধরে ক্রমাগত তারা যে সকল আক্রমণ ও অভিযান পরিচালনা করে ইতিহাসে তা-ই ক্রুসেড নামে পরিচিত।[39]

পোপ ক্রুশের নামে খৃস্টজগতকে উদ্দীপ্ত করেছিল এবং যোদ্ধারা যুদ্ধের সময় ক্রুশ ও ক্রুশের পতাকা ধারণ করত। তাই এ যুদ্ধগুলোর নাম হয় ক্রুসেড যুদ্ধ/Crusades/الحرب الصليبية এবং অংশগ্রহণকারীদেরকে বলা হয় ক্রুসেডার। তারা এগুলোকে ধর্মযুদ্ধও বলে থাকে।[40]

মূলত, খ্রিস্টানরা জেরুজালেমকে তাদের ধর্মের পবিত্র কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করত এবং এটি মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে থাকায় তীর্থযাত্রীদের জন্য প্রবেশাধিকার সীমিত হয়ে পড়েছিল। পোপ এবং ইউরোপীয় শাসকরা ক্রুসেডের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতা ও প্রভাব বাড়াতে

[39] ক্রুসেড (ইতিহাস, ফলাফল, ও প্রভাবসমূহ) - https://www.waytojannah.net/blog/2023/10/21/history-of-crusades/

[40] ক্রুসেড (ইতিহাস, ফলাফল, ও প্রভাবসমূহ) - https://www.waytojannah.net/blog/2023/10/21/history-of-crusades/

চেয়েছিলেন। অন্যদিকে, অনেক নাইট এবং সাধারণ মানুষ ক্রুসেডে অংশ নিয়েছিল সম্পদ এবং জমি অর্জনের আশায়।

২.৩.২ ক্রুসেডের প্রেক্ষাপটসমূহ

ক্রুসেডের অর্থ ধর্মযুদ্ধ করা হলেও ১০৯৫ সাল থেকে আরম্ভ করে ১২৯১ সাল পর্যন্ত চলমান ক্রুসেডগুলো কোন ধর্মের প্রতিষ্ঠা-প্রচার কিংবা রক্ষার জন্যে সংঘটিত কোন যুদ্ধক্রম ছিল না। তা ছিল ভে.গলিক ও ধর্মীয় পরিচয়ে মুসলিম ও খৃস্টান বলে চি‎িত দু'টি জনগোষ্ঠির মধ্যে একের বিরূদ্ধে অন্যের, প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলিমদের বিরূদ্ধে খৃস্টানদের সীমাহীন ঘৃণা- বিদ্বেষ ও নির্মূল করে দেয়ার তীব্র বাসনার প্রকাশরূপে এক উন্মুক্ত রক্ত-খেলা, আফ্রো-এশীয় মুসলিমদের বিরূদ্ধে ইউরোপীয় খৃস্টানদের এক দানবীয় ধ্বংসোল্লাস, বৃহত্তরভাবে প্রাচ্যের বিরূদ্ধে প্রতীচ্যের এক নির্মম মোকাবেলা।খৃস্টান বাহিনীর শ্লোগানে জেরুজালেম উদ্ধারের সংকল্প উচ্চারিত থাকলেও কার্যত এসব যুদ্ধাভিযানের লক্ষ্য ছিল সমগ্র আফ্রো-এশীয় মুসলিম শক্তি তথা মুসলিম উম্মাহকে নির্মূল করার দানবীয় বাসনা। তখনকার নড়বড়ে মুসলিম রাজশক্তিকে পরাস্ত করার সাথে সাথে মুসলিম নিধনও ছিল ক্রুসেডারদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। যার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় তাদের দ্বারা এন্টিয়ক ও জেরুযালেম দখলের পর নির্মম গণহত্যায়। খৃস্টানগণও স্বীকার করেন- 'এর গতি অন্যখাতে প্রবাহিত করা হয়েছিল' (খৃস্টমন্ডলীর ইতিহাসে নারী, ১৮৮পৃ.) । কেন সংঘটিত হয়েছিল এসব ভয়ংকর ক্রুসেড যার মাধ্যমে অগণিত আদম সন্তানের অসহায় রক্ত-খেলায় রচিত হল মানবেতিহাসের এক চরম কলঙ্কময় অধ্যায়।

ইউরোপীয় বিখ্যাত ঐতিহাসিক হিট্টির ভাষায়- 'ক্রুসেড ছিল মুসলিম প্রাচ্যের বিরূদ্ধে খৃস্টান প্রতীচ্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া ও ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ'। অন্য ইউরোপীয় ঐতিহাসিক গীবনের মতে- 'খৃস্টান ইউরোপের অর্বাচীন, বর্বর ও অশিক্ষিত লোকেরাই ক্রুসেডে যোগদান করে'। রোমীয় ধর্ম-রাজ্যের অধিকর্তা পোপ দ্বিতীয় আরবানের আহ্বানে সাড়াদানকারী ইউরোপের তদানীন্তন যেসব রাজন্যবর্গ কর্তৃক সংগঠিত 'অর্বাচীন-বর্বর-অশিক্ষিত' লোকদের বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছিল প্রাচ্যের উপর, তাঁরাও কি ছিলেন অর্বাচীন, বর্বর, অশিক্ষিত ? আক্ষরিক অর্থে তা তো সত্য নয়, তাহলে?

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়- পূর্ণ-দীন ইসলামের আবির্ভাবের আগে জেরুজালেম বিভিন্ন জীবনবিশ্বাসী জাতির অধিকারে এসেছে। বিভিন্ন রাজ্য-সাম্রাজ্যের উত্থান পতনের ফলে জেরুজালেমেরও হস্তান্তর ঘটেছে। তবুও তো সেসব বিভিন্ন জীবনবিশ্বাসী জাতির মধ্যে সংঘটিত হয়নি এমন

রক্তক্ষয়ী ক্রুসেড। হয়েছে শুধুমাত্র মুসলিম-শক্তির বিরূদ্ধে। তাহলে তো ধর্মীয় প্রতিহিংসাই ছিল এর প্রধানতম চালিকা শক্তি। বস্তুত ইসলামের আবির্ভাব গ্রীক ও রোমান সভ্যতার প্রতি ছিল এক বিরাট হুমকি। শুধুমাত্র মুসলিম সাম্রাজ্যের দ্রুত বিস্তৃতির জন্যে নয়, বরং তাওহীদভিত্তিক ইসলামী সংস্কৃতি-সভ্যতার বাস্তব অবদানে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতার ধারা ও প্রভাব ব্যহত হচ্ছে দেখে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল সমগ্র ইউরোপ। তাই ইসলাম ধ্বংসের উদগ্র বাসনাই ইউরোপকে উম্মাদপ্রায় করে তুলেছিল। অন্যান্য কারণ ছিল খৃস্টান সমাজকে উদ্বুদ্ধ করার উপযোগী সহায়ক মাত্র।

এডওয়ার্ড সাঈদ যথার্থই বলেছেন: "ইসলাম ইউরোপের জন্যে এক দীর্ঘস্থায়ী মানসিক আঘাত", "পুরো পশ্চিমা সভ্যতার জন্যে এক অবিচল বিপদস্বরূপ"। "দি রোড টু মক্কা" গ্রন্থের স্বনামধন্য নওমুসলিম লেখক মুহাম্মাদ আসাদ বলেন, "ইউরোপীয় সভ্যতার শৈশবাবস্থার উপর দাঁড়িয়ে আছে ইসলামের প্রতি নিদারুণ বিদ্বেষ"।

ক্রুসেডকে তিনি প্রভুর ইচ্ছা বলে ঘোষণা দিয়ে বলেন: 'বাইতুল মাকদিসকে বাহানা বানাও এবং পূণ্যভূমিকে মুসলিমদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তোমরা এর মালিক হয়ে যাও'। তিনি আরো বলেন: 'এভাবেই খৃস্টান জগতে পুনঃস্থাপিত হবে শান্তি, অবসান হবে ইউরোপের ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধের, অবসান হবে বিধবা ও অনাথদের দুর্দশা, দূরীভূত হবে পরস্বাপহারী লোভাতুর অভিজাতদের দ্বারা চার্চ ও মঠসমূহের উপর আঘাতাক্রমণ'। বস্তুত গৃহযুদ্ধের একটা অবসান কামনা করে পোপ বিদ্যমান অবস্থাটাকে অপরিমিত চাষক্রমজাত বহুবিস্তৃত দারিদ্র ও অপুষ্টি দ্বারা ব্যাখ্যায়িত করলেন। এসব থেকে তখনকার প্রতীচ্যের অবস্থাটাও বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এরপর ২০০ বছর ধরে ধাপে ধাপে চলেছিল এই ক্রুসেড। ইতিহাস থেকে জানা যায় প্রায় নয়টি ক্রুসেড (১০৯৬ সাল থেকে ১২৯১ সাল পর্যন্ত) সংঘটিত হয়েছিলো পুরো ইউরোপ-মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে। অবশেষে নবম ও শেষ ক্রুসেডে ১২৯১ সালের মধ্যেই মিশরের মামলুক সুলতান আশরাফ খলীলের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী আক্রাসহ খৃস্টান অধিকৃত সকল রাজ্যই দখল করে নেন। এভাবে আপাত সমাপ্ত হয় খৃস্টানদের পরিচালিত ক্রুসেড। [41]

[41] ক্রুসেড (ইতিহাস, ফলাফল, ও প্রভাবসমূহ) - https://www.waytojannah.net/blog/2023/10/21/history-of-crusades/

২.৩.৩ ক্রুসেড ও ইসলামের প্রসার

নানা চড়াই উৎরাইর মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হল প্রাচ্যের মুসলিম শক্তিই। তবে এসব ক্রুসেড ও কাউন্টারক্রুসেডের ফলাফল ছিল বিভিন্নমুখী এবং ফলাফলের বিচারে দেখা যায় যে পরিণামে অযোগ্যতা-পীড়িত শেষ বিজয়ীদের চাইতে বিজিতদের লাভই হয়েছে বেশি।

হিট্টি বলেন, 'প্রাচ্য অপেক্ষা প্রতীচ্যের জন্যে ক্রুসেড ছিল অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। খৃস্টানদের ধর্মযুদ্ধের ফলে প্রাচ্য- প্রতীচ্যের মধ্যে যে সম্পর্কের সৃষ্টি হয় তার অবশ্যম্ভাবী ফল ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইউরোপে মুসলিম সভ্যতার অনেক উপকরণের অনুপ্রবেশ। প্রাচ্যের চেয়ে পাশ্চাত্য জগতই এই ক্রুসেড থেকে বেশি উপকৃত হয়েছে'। মুসলিমদের বিশদভাবে জানতে প্রাচ্যবিদ্যা চর্চা শুরু হয় প্রতীচ্যে। কুরআন, হাদীস, আরবী ভাষা ও সাহিত্য, যুক্তি ও জ্ঞান-বিজ্ঞনের উপর প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। যুদ্ধে মুসলমানদেরকে পরাজিত করতে না পেরে প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার নামে এবং বিশ্বব্যাপি খৃস্টধর্ম প্রচারের মাধ্যমে খৃস্টানরা বিজয় লাভের চেষ্টায় মত্ত হয়ে উঠে, যার রেশ চলছে আজও।

ক্রুসেডের ফলে মুসলিমরা সামরিক ও রাজনৈতিকভাবে আরও সংগঠিত হয়। বিশেষ করে সালাহউদ্দিন আইয়্যুবি নেতৃত্বে মুসলিমরা জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করে। ক্রুসেডের ফলে ইসলামের প্রসার কেবল সামরিক বিজয়ের মাধ্যমে হয়নি, বরং বিজ্ঞান, দর্শন ও সংস্কৃতির মাধ্যমে ইউরোপেও ইসলামের প্রভাব বিস্তার লাভ করে।

২.৪ উপনিবেশিক যুগে যাদের রূপান্তর

ইসলামের ইতিহাসে আমরা অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখতে পাই, যেগুলি যুদ্ধের ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসে উলি-খিত শর্তগুলি পুরোপুরি পূরণ করে না। এগুলি মানবীয় দুর্বলতার ফল। ইসলামের দৃষ্টিতে মূলত এগুলি অবৈধ। তবে কোনো ক্ষেত্রেই যুদ্ধের ময়দানের বাইরে গুপ্ত হত্যা, নির্বিচার হত্যা ইত্যাদিতে উপর্যুক্ত কয়েকটি বিভ্রান্ত দল ছাড়া কেউ জড়িত হন নি। পরবর্তীকালের দুটি 'জিহাদ' আমাদের আগ্রহ সৃষ্টি করে: (১) ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে (১৮১৮-১৮৩১খৃ) ভারতে বৃটিশ দখলদারদের বিরুদ্ধে সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর জিহাদ ও (২) আফগান জিহাদ। সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবী জিহাদের শর্তগুলি পূরণ করেছিলেন। তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যের সীমানার বাইরে ভারতের ইসলামী রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার ঘোষণার মাধ্যমে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রপ্রধানের শর্ত পূরণ করেছিলেন। তিনি বৃটিশদেরকে আক্রমণকারী ও দখলদার বাহিনী হিসেবে গণ্য করে জিহাদের বৈধতা প্রমাণ করেন।

আফগান জিহাদও শুরু হয়েছিল প্রায় একইভাবে। সোভিয়েট বাহিনীর আক্রমণ ও জবরদখলের মুখে আফগান জনগণ আলিমদের নেতৃত্বে জিহাদ শুরু করেছিলেন। সাধারণভাবে মুসলিম বিশ্বে এ জিহাদ বৈধ জিহাদ বলেই মনে করা হয়। ফলে বিভিন্ন দেশের অনেক মুসলিম যুবক এ জিহাদে অংশ গ্রহণ করেন। সোভিয়েট বাহিনীর পরাজয়ের পরে এ জিহাদ আন্তঃদলীয় ও আন্তঃগোত্রীয় রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধে পরিণত হয়। দীর্ঘদিন যুদ্ধে অভ্যস্ত আফগান জনগণ অস্ত্রের ভাষাতেই কথা বললেন স্বদেশীয় ও স্বধর্মীয় বিরোধীদের সাথে। প্রত্যেকেই নিজের কাজকে জিহাদ এবং প্রতিপক্ষকে ইসলামের শত্রু বলে দাবি করলেন। বাইরে থেকে আফগান যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদগণ স্বভাবতই কোনো না কোনো আফগান পক্ষে থেকে একই কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েন। অনেকে আফগান ত্যাগ করে নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এসব যুদ্ধ ফেরত সৈনিকদের অনেকের জন্য 'অস্ত্রের ভাষা' পরিত্যাগ করা কষ্টকর হয়ে যায়। এদের অধিকাংশই জিহাদের শর্তের চেয়ে জিহাদের ফযীলতের বিষয়েই বেশি জানতেন ও ভাবতেন। তারা নিজ দেশেও 'জিহাদী' পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টা করেন।[42]

২.৫ আধুনিক যুগে জিহাদের বিবর্তন এবং এর রাজনৈতিক ব্যবহার

"জিহাদ" শব্দটি ইসলামি পরিভাষায় এমন একটি নৈতিক প্রচেষ্টা যা মানুষকে ন্যায়ের পক্ষে ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে উদ্বুদ্ধ করে। কুরআনে এ শব্দটি বহুবিধ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে—আত্মিক নিয়ন্ত্রণ, ধৈর্য, সামাজিক দায়িত্ব এবং নিরূপায় অবস্থায় আত্মরক্ষামূলক সামরিক প্রতিরোধ (Qur'an 25:52; 2:190)। ইসলামী ঐতিহ্যে এই ধারণাটি দুটি মূল স্তরে রূপান্তরিত হয়েছে—জিহাদ আল-নফস (আত্মিক সংগ্রাম) এবং জিহাদ আল-সাইফ (সশস্ত্র সংগ্রাম)। বহু হাদীস ও সুফি সাহিত্য অনুযায়ী, প্রথমটি "আল-জিহাদ আল-আকবর" বা "মহাজিহাদ" নামে অধিকতর মর্যাদা লাভ করে।[43]

তবে ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে এসে জিহাদের এই আধ্যাত্মিক এবং আত্মরক্ষামূলক ধারণাটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। ঊনবিংশ শতকে ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে মুসলিম সমাজে যে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে, তার ভাষ্যেও জিহাদ ছিল একটি প্রধান অনুষঙ্গ। উদাহরণস্বরূপ, পশ্চিম আফ্রিকার ফোদিওর নেতৃত্বে পরিচালিত সশস্ত্র আন্দোলনটি (১৮০৪) ইসলামী পুনর্জাগরণ ও শুদ্ধির নামে পরিচিত হলেও এর রাজনৈতিক

[42] ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ, পৃঃ ১২১
[43] Al-Ghazali, Ihya Ulum al-Din, Vol. 3

বাস্তবতাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ।[44] একইভাবে ভারতের ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহেও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে জিহাদের ডাক দেওয়া হয়।[45]

বিশ্ব রাজনীতির ক্ষেত্রে জিহাদের রাজনৈতিক রূপ সবচেয়ে বেশি আলোচনায় আসে আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসনের (১৯৭৯–৮৯) সময়, যখন যুক্তরাষ্ট্র-সমর্থিত মুসলিম মুজাহিদিনরা এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং এটিকে ধর্মীয় জিহাদ হিসেবে প্রচার করে।[46] এই সময় “জিহাদ” শব্দটি পশ্চিমা সমর্থনপুষ্ট এক আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক কৌশলে রূপ নেয়। পরবর্তীকালে এই একই ধারণা আত্মঘাতী চরমপন্থার হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায়, যখন আল-কায়েদা ও ইসলামিক স্টেট (IS) এর মতো গোষ্ঠী জিহাদের নামে বেসামরিক জনগণের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাতে থাকে (Cook, David. Understanding Jihad, 2005)। এ ধরণের সহিংস ব্যবহার কুরআনের মৌলিক নির্দেশনার বিরুদ্ধে যায়, যেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, “তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না” (Qur’an 2:190)।

সমকালীন বহু ইসলামি চিন্তাবিদ এই রাজনৈতিক ও সহিংস জিহাদের ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। তাঁরা কুরআনের সামগ্রিক বয়ান ও প্রসঙ্গভিত্তিক পাঠের মাধ্যমে জিহাদকে মূলত আত্মরক্ষামূলক ও নৈতিক প্রচেষ্টা হিসেবে উপস্থাপন করেন।[47] এদের মতে, প্রাক-আধুনিক ফিকহবিদদের অনেক দৃষ্টিভঙ্গি ঐতিহাসিকভাবে প্রেক্ষিতনির্ভর এবং তা আধুনিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পটভূমিতে আর প্রযোজ্য নয়।

আধুনিক যুগে জিহাদের ধারণাটি এইভাবে একটি দ্বৈত রূপ রুপান্তরিত হয়েছে। একদিকে এটি ইসলামী নৈতিকতা, আত্মশুদ্ধি ও প্রতিরোধের একটি মহান আদর্শ, অপরদিকে রাজনৈতিকভাবে অপব্যবহৃত একটি বিষয়, যা কখনো ক্ষমতার বৈধতা প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার, কখনো সহিংসতাকে বৈধতা দেয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়।

২.৫.১ জিহাদ : মুসলিম বিনাশের হাতিয়ার

“জিহাদ” শব্দটিকে ভিন্ন আঙ্গিকে সংজ্ঞায়িত করে পশ্চিমারা ইসলামকে নেতিবাচকভাবে বিশ্ব দরবারে উপস্থাপন করছে, কখনো মুসলিমদের দমন করার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে,

---

[44] Last, Murray. *The Sokoto Caliphate*. Longman, 1967

[45] Metcalf, Barbara D. *Islamic Revival in British India: Deoband*, 1860–1900. Princeton University Press, 1982

[46] Rashid, Ahmed. *Taliban: Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia*. Yale University Press, 2000

[47] El Fadl, Khaled Abou. *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*. HarperOne, 2005

আবার কখনো মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরীন বিভক্তি ও দুর্বলতা সৃষ্টির অস্ত্র হিসেবে একে কাজে লাগায়। এই অভিযানগুলোকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যেন এটা ইসলামি চরমপন্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ, অথচ বাস্তবে এগুলো ছিল ক্ষমতা ও সম্পদের দখলের জন্য চালানো সামরিক পদক্ষেপ। যেন এক মুসলিম বিনাশের হাতিয়ার!

মিডিয়াতে দীর্ঘদিন ধরে "জিহাদ", "শরিয়াহ" বা "খিলাফাহ" শব্দগুলোকে এমনভাবে দেখানো হয়েছে যেন এগুলো আধুনিক সভ্যতার শত্রু।[48] এর ফলে সাধারণ অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে ভয় বা বিদ্বেষ (Islamophobia) তৈরি হয়েছে। ডানপন্থি রাজনৈতিক দলগুলো এই ভয়কে কাজে লাগিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে আইন করে, সমাজে তাদেরকে একঘরে করে তোলে।

এর পাশাপাশি, বড় বড় রাষ্ট্র জিহাদের ধারণাকে কাজে লাগিয়ে মুসলিম সমাজের ভেতরেও বিভক্তি তৈরি করে। যেমন, ঠান্ডা যুদ্ধের সময় আমেরিকা আফগানিস্তানে কিছু ইসলামি গোষ্ঠীকে "জিহাদি" বলে প্রশিক্ষণ দেয়, অস্ত্র দেয়। কিন্তু পরে, সেই একই গোষ্ঠীকে "সন্ত্রাসী" বলে অভিযানের লক্ষ্য বানায়।[49] এমন দ্বিমুখী আচরণ মুসলিমদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও ক্ষোভ সৃষ্টি করে।

---

[48] Esposito, John L. *Unholy War: Terror in the Name of Islam*, 2002

[49] Rashid, Ahmed. *Taliban: Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia*. Yale University Press, 2000

৩. আধুনিক ভুল ধারণা : জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদ

ইসলামে "জিহাদ" মানে শুধু যুদ্ধ নয়, বরং এটা এক ধরনের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক চেষ্টা— নিজেকে শুদ্ধ করা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া এবং সমাজে ভালো কিছু প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। কিন্তু আধুনিক যুগে, বিশেষ করে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর থেকে, অনেক অমুসলিম রাষ্ট্র, রাজনীতি-নেতৃত্ব এবং পশ্চিমা মিডিয়া জিহাদ শব্দটিকে একতরফাভাবে "সন্ত্রাস" বা "সহিংস ধর্মীয় যুদ্ধ" হিসেবে তুলে ধরতে শুরু করে। এর পেছনে ছিল রাজনৈতিক ও কৌশলগত স্বার্থ।

এই ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে মুসলিমদের ওপর দমন-পীড়ন চালানো সহজ হয়েছে। যেমন, যুক্তরাষ্ট্র **"War on Terror"** নামে যে অভিযান চালায়, সেখানে আফগানিস্তান, ইরাকসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশকে লক্ষ্য করা হয়।[50]

ইসলামকে একটি বর্বর ধর্ম হিসাবে উপস্থাপন করার জন্য ইসলামের শত্রুরা প্রচার করেঃ ইসলামে নাকি জিহাদের নামে অন্যায়ভাবে অমুসলিমদেরকে হত্যা করা হয়। তাদের প্রচারণায় অনেক সময় মনে হয় জিহাদের উদ্দেশ্য বুঝি শুধু অমুসলিমদের হত্যা করা আর বিনাশ করা!এমনকি মুসলিম সমাজেও 'জিহাদ' শব্দটি প্রায় ট্যাবুতে পরিনত হয়েছে।[51]

জঙ্গি ও জঙ্গিবাদ শব্দদ্বয় ইংরেজি (militant, militancy) শব্দদ্বয়ের অনুবাদ। ইদানিং এগুলি আমাদের মধ্যে অতি পরিচিত ও অতিব্যবহৃত। শব্দগুলি কিছু দিন আগেও এত প্রচলিত ছিল না। আর আভিধানিক বা ব্যবহারিকভাবে এগুলি নিন্দনীয় বা খারাপ অর্থেও ব্যবহৃত হতো না। শাব্দিক বা রূপক ভাবে যোদ্ধা, সৈনিক বা যুদ্ধে ব্যবহৃত বস্তু বুঝাতে এ শব্দগুলি ব্যবহৃত হতো। বৃটিশ ইন্ডিয়ার কমান্ডার ইন চিফকে 'জঙ্গিলাট' বলা হতো।[52]

শক্তিমত্ত বা উগ্র বুঝাতেও এ শব্দ ব্যবহার করা হয়। (Oxford Advanced Learner's Dictionary) -তে বলা হয়েছে: militant. adj. favouring the use of force or strong pressure to achieve one's aim. ...militant: n. militant person, esp.

[50] Chomsky, Noam. Hegemony or Survival, 2003

[51] জিহাদের উদ্দেশ্য কি শুধুই অমুসলিমদেরকে হত্যা করা? - https://shorturl.at/42j6D

[52] শ্রী শৈলেন্দ বিশ্বাস, সংসদ বাংলা-ইংরেজি অভিধান। পৃঃ ৪৬২

in politics. "মিলিট্যান্ট (জঙ্গি): যে ব্যক্তি তার উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শক্তি বা জোরালো প্রভাব ব্যবহার করা সমর্থন করে।...."[53]

Merriam-Wepster's Collegiate Dictionary --তে বলা হয়েছে: "militant 1: engaged in warfare or combat: fighting. 2: aggressively active (as in a cause)." অর্থাৎ: মিলিট্যান্ট (জঙ্গি): যুদ্ধ বা সম্মুখসমরে লিপ্ত ব্যক্তি, যুদ্ধরত। উগ্রভাবে সক্রিয়।" দ্বিতীয় অর্থটিকে আরো একটু ব্যাখ্যা করে মাইক্রোসফট এনকার্টা অভিধানে মিলিট্যান্ট বা জঙ্গি শব্দের অর্থে বলা হয়েছে: (aggressive: extremely active in the defense or support of a cause, often to the point of extremism): "আগ্রাসী, কোনো বিষয়ের পক্ষে বা সমর্থনে চরমভাবে সক্রিয়, যা প্রায়শ চরমপন্থা পর্যন্ত পৌঁছায়।"

এ সকল অর্থ কোনোটিই সরাসরি বে-আইনী অপরাধ বুঝায় না। এ সকল অর্থে আমাদের দেশের সকল রাজনৈতিক, আদর্শিক, পেশাজীবি ও সামাজিক দলই "মিলিট্যান্ট" বা "জঙ্গি"। কারণ সকলেই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শক্তি বা 'প্রেসার' প্রয়োগ পছন্দ করেন এবং সকলেই তাদের নিজেদের আদর্শ ও স্বার্থ রক্ষায় বা প্রতিষ্ঠায় "উগ্রভাবে সক্রিয়"।

কিন্তু আমরা বর্তমানে 'জঙ্গি' বলতে বুঝি বে-আইনী সহিংসতা ও খুনখারাপি। এ অর্থে প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত পরিভাষা সন্ত্রাস (terrorism) । কিন্তু আমরা বাংলায় পত্র-পত্রিকা, বক্তৃতা-বিবৃতি ও লেখালেখি থেকে বুঝি যে, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও চরমপন্থার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যারা সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্র বা সর্বহারার রাজত্ব প্রতিষ্ঠার নামে উগ্রতা, অস্ত্রধারণ, সহিংসতা বা খুনখারাপিতে লিপ্ত হন তাদেরকে আমরা "চরমপন্থী" (extremist) বলি। আর যারা ইসলামের নামে বা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নামে উগ্রতা, অস্ত্রধারণ, সহিংসতা বা খুনখারাপিতে লিপ্ত তাদেরকে বলি "জঙ্গি"। আর যারা প্রচলিত সাধারণ রাজনৈতিক দলের নামে বা কোনো দল, মতবাদ বা আদর্শের নাম না নিয়ে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্য উগ্রতা, অস্ত্রধারণ, সহিংসতা বা খুনখারাপিতে লিপ্ত হয় তাদেরকে সন্ত্রাসী বলি।

এরূপ বিভাজন বা পার্থক্যের কোনো ভাষাগত বা তথ্যগত ভিত্তি আছে বলে জানা যায় না। বরং ইংরেজি ব্যবহার থেকে বুঝা যায় যে, militant/militancy জঙ্গি বা জঙ্গিবাদ শব্দ সরাসরি 'বে-আইনী কর্ম' বা অপরাধ বুঝায় না। বরং বেআইনী বা আইনসম্মত যে কোনো প্রকারের উগ্রতা বুঝাতে (militant, militancy): জঙ্গি ও জঙ্গিবাদ শব্দদ্বয় ব্যবহার করা হয়। চরমপন্থা ও চরমপন্থী (extremism/extremist) শব্দদ্বয়ও সরাসরি অপরাধ বা বে

[53] A.S Hornby, Oxford Advanced Learner's Dictionary, P 738

আইনী কর্মকান্ড বুঝায় না। পক্ষান্তরে সন্ত্রাস (terrorism) শব্দটিই সরাসরি অপরাধ ও বে-আইনী কর্মকান্ড বুঝায়।

এভাবে আমরা দেখছি যে, ‘‘জঙ্গিবাদ’’ শব্দটি কোনোরূপ ভাষাগত ভিত্তি ছাড়াই ‘ইসলামের নামে সহিংসতা’ অর্থে ব্যবহার হচ্ছে। অথচ মূল ভাষাগত অর্থে ইসলামের নামে, অন্য কোনো ধর্মের নামে, ধর্মনিরপেক্ষতার নামে, গণতন্ত্রের নামে, সমাজতন্ত্রের নামে, অন্য যে কোনো মতবাদ, আদর্শ বা অধিকারের নামে উগ্রতার আশ্রয় গ্রহণকারী মানুষকে জঙ্গি বলা চলে এবং তার মতামতকে জঙ্গিবাদ বলা চলে। ইংরেজি ব্যবহার এটিই প্রমাণ করে।

বস্তুত জঙ্গিবাদ বলতে আমরা যা বুঝাচ্ছি ও বুঝছি সে অর্থটি প্রকাশের জন্য সঠিক শব্দ হলো সন্ত্রাস। সন্ত্রাস-এর সাধারণ পরিচয় দিয়ে সন্ত্রাস বিষয়ক আলোচনার শুরুতে এনসাইক্লোপিডীয়া ব্রিটানিকায় বলা হয়েছে: terrorism: the systematic use of violence to create a general climate of fear in a population and thereby to bring about a particular political objective: ‘‘সন্ত্রাস: নির্দিষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমন্বিতভাবে সহিংসতার ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা।’’

মার্কিন সরকারের ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফ. বি. আই) terrorism বা সন্ত্রাসের সংজ্ঞায় বলেছে: “the unlawful use of force and violence against persons or property to intimidate or coerce a government, the civilian population, or any segment thereof, in furtherance of political or social objectives”, কোনো সরকার বা সাধারণ নাগরিকদেরকে ভয় দেখিয়ে রাজনৈতিক বা সামাজিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ব্যক্তি বা সম্পদের বিরুদ্ধে ক্ষমতা বা সহিংসতার বেআইনি ব্যবহার করা।’’

এ সংজ্ঞায় কর্মের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। শক্তি, ক্ষমতা বা সহিংসতার ব্যবহার যদি বে-আইনী হয় তবে তা ‘সন্ত্রাস’ বলে গণ্য হবে। আর যদি তা ‘আইন-সম্মত’ হয় তবে তা ‘সন্ত্রাস’ বলে গণ্য হবে না। এখানে সমস্যা আইন ও বে-আইন নির্ণয় নিয়ে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশ ইরাকে ‘রাজনৈতিক পরিবর্তন’, ‘স্বৈরশাসন থেকে মুক্তি আনয়ন’, ‘মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা’ ইত্যাদি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সরকার ও জনগণের বিরুদ্ধে ‘শক্তি ও সহিংসতা’ ব্যবহার করেছে এবং করছে। এ ব্যবহারকে তারা

'আইনসম্মত' ও তাদের মৌলিক অধিকার ও দায়িত্ব বলে মনে করছেন। কাজেই তারা একে সন্ত্রাস বলে মানতে রাজি নন, যদিও বিশ্বের অনেক মানুষই একে সন্ত্রাস বলেই মনে করছেন। পক্ষান্তরে ইরাকের প্রতিরোধ যোদ্ধাগণ "বিদেশী দখলদাত্বি" মুক্ত হতে মার্কিন সেনাবাহিনী ও তাদের স্থানীয় সহযোগীদের বিরুদ্ধে "শক্তি ও সহিংসতা" ব্যবহার করছেন এবং আফগানস্থানে তালিবানগণ রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন সাধনের উদ্দেশ্যে আফগান সরকারের সেনাবাহিনী, কর্মকর্তা ও বিদেশী সৈন্যদের বিরুদ্ধে 'শক্তি ও সহিংসতা' ব্যবহার করছেন। তারা তাদের এ কর্মকে আইনসঙ্গত দায়িত্ব বলে মনে করেন, পক্ষান্তরে অন্যরা একে 'সন্ত্রাস' বলে গণ্য করছেন। এভাবে আমরা দেখছি যে, সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীকে চিহ্নিত করা কঠিন এবং এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ প্রায় অসম্ভব। এজন্য অন্য অনেক সমাজবিজ্ঞানী কর্মের উপর নির্ভর না করে আক্রান্তের উপর নির্ভর করে সন্ত্রাসকে সংজ্ঞায়িত করতে চেষ্টা করেছেন। তাদের ভাষায়: "terrorism is premeditated, politically motivated violence perpetrated against noncombatant targets", "রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে পূর্বপরিকল্পিতভাবে অযোদ্ধা লক্ষ্যের বিরুদ্ধে সহিংসতা সন্ত্রাস।"

মার্কিন সরকার এ সংজ্ঞা গ্রহণ করেছেন বলে এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এ সংজ্ঞার দ্বারা সন্ত্রাস বা সন্ত্রাসী চিহ্নিত করাও বিতর্কিত হতে বাধ্য। নিরস্ত্র ফিলিস্তিনী যুবকগণ যখন সশস্ত্র ইসরায়েলী সৈন্যদের প্রতি ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করেন অথবা ফিলিস্তিনী মুক্তিযোদ্ধাগণ যখন সশস্ত্র ইসরায়েলীয় সৈন্যদেরকে আক্রমন করেন, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাশ্চাত্য বিশ্ব তাকে সন্ত্রাস বলে আখ্যায়িত করে। অথচ 'অযোদ্ধা' নিরস্ত্র ফিলিস্তিনী শিশু ও নারীপুরুষদের প্রতি ইসরায়েলী সৈন্যদের গুলি ছোড়া, বোমা নিক্ষেপ ইত্যাদি কর্মকে তারা সন্ত্রাস বলে গণ্য করেন না। বরং আত্মরক্ষার স্বাভাবিক অধিকার বলে দাবি করেন।

ইরাকে প্রতিরোধ যোদ্ধা বা শিয়া-সুন্নি সংঘাতে লিপ্ত বিভিন্ন দল নিরস্ত্র অযোদ্ধা মানুষদের হত্যা করলে তাকে সকলেই সন্ত্রাস বলে গণ্য করেন। কিন্তু মার্কিন বাহিনী ফালুজা এবং অন্যান্য স্থানে অযোদ্ধা নিরস্ত্র মানুষদেরকে হত্যা করলে তাকে সন্ত্রাস বলে কখনোই স্বীকার করা হয় না।

এভাবে আমরা দেখছি যে, যেভাবেই সংজ্ঞায়িত করা হোক না কেন, কোনো মানুষ বা মানবগোষ্ঠীকে 'সন্ত্রাসী' বলে চিহ্নিত করা খুবই কঠিন। সর্বোপরি, যুগে যুগে সকল স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুক্তি ও স্বাধীনতা আন্দোলনসহ বিভিন্ন জাতি, দল বা রাষ্ট্র এরূপ সহিংসতার ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের স্বাধীনতা, মুক্তি ও গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় করেছেন। আধুনিক ইতিহাসে আইরিশ রিপাবলিকান আর্মী, আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস, তামিল টাইগার, পূর্ব

তিমুরের স্বাধীনতাকামী দলসমূহ ও অন্যান্য অনেক দল ও সংগঠন তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সন্ত্রাসী কর্মান্ডের আশ্রয় নিয়েছে ও নিচ্ছে। বিভিন্ন সময়ে সকল রাষ্ট্র, এমনকি জাতিসংঘও এরূপ অনেক 'সন্ত্রাসী' কর্মকান্ড সমর্থন করেছে এবং সন্ত্রাসী সংগঠনগুলিকে সাহায্য করেছে। যেমন হিটলালের দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ফরাসীদের 'সন্ত্রাসী' ও 'সহিংস' প্রতিরোধ আন্দোলন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী সরকারের বিরুদ্ধে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের 'সহিংস' ও 'সন্ত্রাসী' প্রতিরোধ আন্দোলন।

আরো লক্ষণীয় যে, স্বাধীনতা আন্দোলন ও প্রতিরোধ যুদ্ধকে "সন্ত্রাস" বলে আখ্যায়িত করা স্বৈরাচার, দখলদার বা সাম্রাজ্যবাদীদের চিরচারিত নিয়ম। নেপালের মাওবাদীদেরকে সন্ত্রাসী তালিকাভূক্ত করা হয়েছে। কিন্তু জনগণ তাদেরকেই পছন্দ করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সর্বদা "সন্ত্রাসী" বলে আখ্যায়িত করেছে পাকিস্তান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। এ জন্য বলা হয়: "One man's terrorist is another man's freedom fighter" যুদ্ধের ক্ষেত্রেও উভয় পক্ষ প্রতিপক্ষের সৈন্য ও নাগরিকদের মধ্যে ভীতি সঞ্চারে সচেষ্ট থাকে। তবে সন্ত্রাসের সাথে যুদ্ধের মৌলিক পার্থক্য হলো, সাধারণ যুদ্ধ ও গেরিলা যুদ্ধ উভয় ক্ষেত্রেই যোদ্ধারা মুলত যোদ্ধা বা যুদ্ধ বিষয়ক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করতে সচেষ্ট থাকে এবং সামরিক বিজয়ই লক্ষ্য থাকে। পক্ষান্তরে সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে সামরিক বিজয় উদ্দেশ্য থাকে না। এক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্যই হলো সামরিক অসামরিক নির্বিচারে সকল লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করে ভীতি সঞ্চারের মাধ্যমে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করা। "Terrorism proper is thus the systematic use of violence to generate fear, and thereby to achieve political goals, when direct military victory is not possible. This has led some social scientists to refer to guerrilla warfare as the 'weapon of the weak' and terrorism as the 'weapon of the weakest'." এজন্য মূলত সন্ত্রাস হলো যেখানে সামরিক বিজয় সম্ভব নয় সেখানে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সুশৃঙ্খলিতভাবে সহিংসতার ব্যবহারের মাধ্যমে ভীতি সঞ্চার করা। এজন্য কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানী বলেছেন যে, গেরিলা যুদ্ধ দুর্বলের অস্ত্র এবং সন্ত্রাস দুর্বলতমের অস্ত্র।[Encyclopaedia Britannica, CD Version, 2005, Article: Terrorism][54]

54 ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ, পৃঃ ৮-৯

সশস্ত্র জিহাদ কেবল মুসলিম রাষ্ট্রের বৈধ নেতা, সাধারণত খলিফা, কর্তৃক ঘোষণা করা যেত। এ ছাড়াও নিরস্ত্র নাগরিক, নারী, শিশু ও সম্পদের উপর হামলা নিষিদ্ধ ছিল — যা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশনাতেই স্পষ্টভাবে বিবৃত।

৩.১ জিহাদ সম্পর্কিত আধুনিক ভুল ধারণা

আরবিতে জিহাদ (جهاد) কথাটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সংগ্রাম করা এবং শক্তি ব্যয় করা। ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় জিহাদ হচ্ছে, আল্লাহর বাণীকে সুউচ্চ করার জন্য ও পৃথিবীতে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠার জন্য একজন মুসলিমের চেষ্টা-সংগ্রাম।

অমুসলিমদেরকে মেরে ফেলা ইসলামী জিহাদের উদ্দ্যেশ্য নয়। বরং এর উদ্দ্যেশ্য হচ্ছে আল্লাহর দ্বীনকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর শরিয়াহর বিধান প্রতিষ্ঠা করা এবং মানুষকে সৃষ্টির দাসত্ব থেকে স্রষ্টার দাসত্বের দিকে নিয়ে আসা। বিভিন্ন দ্বীনের অবিচার থেকে মুক্ত করে ইসলামের ন্যায়বিচারের দিকে নিয়ে আসা। আল্লাহ বলেছেন, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ 'আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই করো যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং দ্বীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়'। (সুরা আনফাল ৮ : ৩৯)

এ আয়াতের তাফসিরে শায়খ আব্দুর রহমান আস সা'দী বলেছেন, "এখানে আল্লাহ তাঁর জন্য জিহাদের উদ্দ্যেশ্য বর্ণনা করছেন। কাফিরদের রক্ত ঝড়ানো বা তাদের সম্পদ কেড়ে নেয়া এর উদ্দ্যেশ্য নয়। বরং এর উদ্দ্যেশ্য হচ্ছে দ্বীন (ইবাদাত) শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। এবং আল্লাহর দ্বীন অন্য সকল দ্বীনের উপর প্রবল হয়। আর যা কিছু এর বিরুদ্ধে যায়, সেগুলোকে দমন করা। হোক তা শির্ক বা অন্য কিছু – যাকে আয়াতে 'ফিতনা' কথাটির দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। যদি এই উদ্দ্যেশ্য অর্জিত হয়ে যায়, তাহলে কোনো যুদ্ধ বা হত্যা চলবে না"। [তাফসির সা'দী, পৃষ্ঠা ৯৮]

যেসব কাফিরের সাথে আমরা জিহাদ করি, এর দ্বারা তো তারাই উপকৃত হবে। আমরা তাদের সাথে সংগ্রাম করি এবং তাদের বিরুদ্ধে লড়ি যাতে করে তারা আল্লাহর মনোনিত দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। যা তদেরকে ইহকাল ও পরকালের নাজাতের দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহ বলেছেন, كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ "তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাত, মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদেরকে বের করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজে আদেশ করবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে" (সুরা আলি ইমরান ৩ : ১১০)

ইমাম বুখারী(র.) [হাদিস নং ৪৫৫৭] বর্ণনা করেছেন, আবু হুরাইরা (রা.) বলেছেন, "তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাত, মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদেরকে বের করা হয়েছে" কথাটির অর্থ হলো, তোমরা মানবজাতির জন্য সর্বোত্তম মানুষ। তোমরা তাদেরকে গলায় শৃঙ্খলবদ্ধ করে নিয়ে আসবে যতক্ষন না তারা ইসলামে প্রবেশ করে। ইবনুল জাওযি (র.) বলেছেন, "এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, তারা (যুদ্ধে) ধৃত হবে এবং আবদ্ধ হবে। কিন্তু যখন তারা ইসলামের সত্যতা জানতে পারবে, তখন নিজ ইচ্ছায় তাতে প্রবেশ করবে এবং এভাবে জান্নাতের অধিকারী হবে।"[55]

৩.১.১ মিডিয়া অফ পশ্চিমা বয়ানে 'জিহাদ' = সন্ত্রাসবাদ?

জিহাদ প্রকৃতপক্ষে একটি নৈতিক, আত্মিক এবং সমাজকল্যাণমূলক প্রচেষ্টা হলেও, অমুসলিম রাষ্ট্র ও গোষ্ঠীগুলো তা বিকৃত করে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করে চলেছে। এর ফলে শুধু মুসলিমদের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক নেতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়নি, বরং মুসলিম সমাজের ভেতরকার ঐক্য, আত্মবিশ্বাস এবং আত্মপরিচয়ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

পশ্চিমারা মুসলিমদেরকে এমনভাবে প্রকাশ করে, যেন মুসলিমরা জিহাদ করে কেবল অমুসলিমদের উপরে আধিপত্য করা এবং তাদেরকে সমূলে উতখাত করার জন্য। তবে আধুনিক যুগে পশ্চিমাদের সবচেয়ে গোমরাহীর বিষয় হচ্ছে এটি। কেননা, হাদিসে বলা হয়েছে---রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন কারণ ব্যতিত মু'আহিদ (ইসলামী রাষ্ট্রে চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম) কোন ব্যক্তিকে হত্যা করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন। [সুনান আবু দাউদ; জিহাদ অধ্যায় ১৫, হাদিস নং : ২৭৬০(সহীহ)]

মুতার যুদ্ধে রওনার সময় রাসূলুল্লাহ)ﷺ(তাঁর বাহিনীকে নির্দেশ দেন, 'তোমরা কোনো নারীকে হত্যা করবে না, অসহায় কোনো শিশুকেও না; আর না অক্ষম বৃদ্ধকে। আর কোনো গাছ উপড়াবে না, কোনো খেজুর গাছ জ্বালিয়ে দেবে না। আর কোনো গৃহও ধ্বংস করবে না।' [সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ১৭৩১]

"... আমি তোমাদের কয়েকটি উপদেশ দিয়ে প্রেরণ করছি, (যুদ্ধক্ষেত্রে) তোমরা বাড়াবাড়ি করবে না, ভীরুতা দেখাবে না, (শত্রুপক্ষের) কারো চেহারা বিকৃতি ঘটাবে না, কোনো শিশুকে হত্যা করবে না, কোনো গির্জা জ্বালিয়ে দেবে না এবং কোনো বৃক্ষও উৎপাটন করবে না।" [মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক : ৯৪৩০]

---

[55] জিহাদের উদ্দেশ্য কি শুধুই অমুসলিমদেরকে হত্যা করা? - https://shorturl.at/42j6D

যুদ্ধের ময়দানেও এভাবে ইসলাম ন্যায়-ইনসাফের নির্দেশ দিয়েছে। মোটেও "সকল অমুসলিমদের হত্যা করা"র নির্দেশ দেয়নি। যারা বলতে চায় ইসলাম "সকল অমুসলিমকে হত্যা করা"র নির্দেশ দেয়, তারা এক মারাত্মক নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয়। সকল অমুসলিমকে যদি হত্যাই করা হয়, ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হবে কাকে বা ইসলামের বিস্তার হবে কিভাবে?[56]

তবে কারো উপর জিহাদ ফরয হওয়ার জন্য অবশ্যই তার মধ্যে এই শর্তগুলো থাকতে হবে: (ক) তাকে মুসলিম হতে হবে, (খ) বিবেক-বুদ্ধি থাকতে হবে, (গ) প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে, (ঘ) স্বাধীন হতে হবে, (ঙ) পুরুষ হতে হবে, (চ) শারীরিক সক্ষমতা থাকতে হবে এবং (ছ) জিহাদে খরচ করার মতো অর্থ থাকতে হবে *(দ্র. ঐ)*।

বুঝা গেলো, জিহাদ কস্মিনকালেও কারো প্রতি যুলম নয়। বরং ইসলামে জিহাদ অত্যন্ত পরিকল্পিত, সুশৃঙ্খলিত ও নিয়ন্ত্রিত একটি বিষয়, যার সাথে উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসবাদের দূরতম কোনো সম্পর্কও নেই। ইসলামে জিহাদের নির্দেশনা না মেনে কারো জান-মাল-ইযযতের উপর আক্রমণ করা কখনই সমর্থিত নয়। বরং তখন তা জিহাদ না হয়ে উল্টো উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসবাদে পরিণত হয়। আর এর কারণে ইসলাম ও মুসলিমরা কলঙ্কিত হয় এবং পিছিয়ে যায়। সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয় এবং অশান্তি, বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়ে। ফলে জিহাদকে চরমপন্থা, উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসবাদের সাথে গলিয়ে ফেলা নেহায়েত অন্যায়; যে পথে হেঁটে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের অপচেষ্টা করে যাচ্ছে সমগ্র কাফের-দুনিয়া। আর এপথে মদদ যোগাচ্ছে একশ্রেণির মুসলিম তরুণ-যুবক, যারা বুঝে না বুঝে কুরআন-হাদীছের কিছু বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করে অতি আবেগী ও অতি উৎসাহী হচ্ছে আর বিভিন্ন মুসলিম সরকার, জনগণ ও সালাফী আলেমগণের ব্যাপারে নানা ফতওয়া জারি করছে, তাদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করছে এবং হরেক রকম ট্যাগ লাগাচ্ছে। বরং আরো আগ বাড়িয়ে তারা চোরাগুপ্তা ও অতর্কিত হামলা চালিয়ে অশান্তির দাবানল ছড়িয়ে দিচ্ছে বিশ্বময়।[57]

৩.১.২ জিহাদ এবং সন্ত্রাসবাদের মধ্যে পার্থক্য

বর্তমানে পশ্চিমা মিডিয়ার সবচেয়ে বড় সফলতা হলো জিহাদ এবং সন্ত্রাসবাদকে একই সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা এবং মুসলিমদেরকে 'জঙ্গি' আখ্যায়িত করা। তবে জিহাদ এবং সন্ত্রাসবাদের মধ্যে কিছু বেসিক পার্থক্য রয়েছে, যা অনেকে সহজে

56 জিহাদের উদ্দেশ্য কি শুধুই অমুসলিমদেরকে হত্যা করা? - https://shorturl.at/42j6D

57 জিহাদ ও উগ্রবাদ এক নয় https://al-itisam.com/article_details/3247

বুঝতে চায় না। জিহাদ হলো- জান, মাল, ইলম, আমল, লেখনি, বক্তৃতার মাধ্যমে, প্রয়োজনে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে আল্লাহর দীন তথা ইসলামকে সমুন্নত বা বিজয়ী করার জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালানো। ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ তিন প্রকারের। যথা- ১. স্বীয় নফসের সাথে জিহাদ করা, ২. জ্ঞানের সাহায্যে জিহাদ করা, ৩. ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। এটি জিহাদের সর্বোচ্চ চূড়া। জিহাদ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ কর যেভাবে জিহাদ করা উচিত।" (সূরা আল-হাজ্জ : ৭৮)

অন্যদিকে সন্ত্রাস হলো- অন্যায়ভাবে রক্তপাত করে রাজ্য জয়, ক্ষমতা দখল, সম্পদ অর্জন করা এবং লুটতরাজ ও খুন-খারাবির দ্বারা নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্ব বিস্তার করা। বর্তমানে আমাদের সমাজে সন্ত্রাস ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সন্ত্রাসীরা সমাজ ও রাষ্ট্রে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। ফলে মানুষ উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতায় জীবনযাপন করছে। তাই শান্তির সুখের পায়রা আজ বহু দূরে। অনেক সন্ত্রাসী ইসলামের লেবাস গ্রহণ করে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালাচ্ছে। আবার অনেকে ইসলামি আন্দোলনকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হিসেবে আখ্যায়িত করছে।

মূলত জিহাদ ও সন্ত্রাস দুটি পরস্পরবিরোধী কাজ। জিহাদ হলো মানুষের কল্যাণে, আর্তমানবতার সেবায়, নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষকে শোষণ ও জুলুমের হাত হতে রক্ষার প্রাণপণ প্রয়াস। আর সন্ত্রাস হলো শান্তি-শৃঙ্খলা ও জানমালের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ।

প্রকৃতপক্ষে, ইসলামে কাফিরদেরকে যে বিধানের আলোকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছে তাতে 'কাফির যোদ্ধা এবং কাফির হত্যার' ব্যাপারটা ব্যাখ্যা ব্যতিরেখে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। কেননা, কুরআনে যেমন কোথাও কোথাও কাফিরদের বা মুশরিকদের হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তেমনি অন্যত্র শুধু যুদ্ধরতদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন আমরা দেখেছি যে, আল্লাহ বলেছেন: "আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর তাদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করছে এবং সীমালঙ্ঘন করো না।" অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন: "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা মুশরিকদের মধ্য থেকে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে তাদের প্রতি। সুতরাং তোমরা যমীনে বিচরণ কর চার মাস, আর জেনে রাখ, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না, আর নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদের অপদস্থকারী। আর মহান হজ্জের দিন মানুষের প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে ঘোষণা, নিশ্চয় আল্লাহ মুশরিকদের থেকে দায়মুক্ত এবং তাঁর রাসূলও। অতএব যদি তোমরা তাওবা কর, তাহলে তা তোমাদের জন্য উত্তম। আর যদি তোমরা ফিরে যাও, তাহলে জেনে রাখ, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না। আর যারা কুফরী করেছে তুমি তাদেরকে

যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও। তবে মুশরিকদের মধ্য থেকে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছ, অতঃপর তারা তোমাদের সাথে কোনো ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করেনি, তোমরা তাদেরকে দেওয়া চুক্তি তাদের নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত পূর্ণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালবাসেন। অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো (ঘোষিত ৪ মাস) অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর, তাদেরকে পাকড়াও কর, তাদেরকে অবরোধ কর এবং তাদের জন্য প্রতিটি ঘাটিতে বসে থাক। তবে যদি তারা তাওবা করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয় তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম করুণাম। আর যদি মুশরিকদের কেউ তোমার কাছে আশ্রয় চায়, তাহলে তাকে আশ্রয় দাও, যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনে, অতঃপর তাকে তার নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দাও। তা এজন্য যে তারা অজ্ঞ সম্প্রদায়। কীভাবে মুশরিকদের জন্য চুক্তি-অঙ্গীকার থাকবে আল্লাহর কাছে ও তাঁর রাসূলের কাছে? অবশ্য মসজিদে হারামের কাছে যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছ তাদের কথা আলাদা। যতক্ষণ তারা তোমাদের জন্য ঠিক থাকে, ততক্ষণ তোমরাও তাদের জন্য ঠিক থাক। নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালবাসেন।''[58]

এখানে আল্লাহ বলেছেন: ''যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো (ঘোষিত ৪ মাস) অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর ...'' অনেক সময় অমুসলিম লেখকগণ এবং কখনো আবেগী মুজাহিদগণ কুরআনের অন্যান্য আয়াত বাদ দিয়ে এবং এ আয়াতগুলি আগের ও পরের বক্তব্য বাদ দিয়ে শুধু এ কথাগুলি উদ্ধৃত করে দাবি করেন যে, ইসলামে সকল কাফির বা অমুসলিমকে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অথচ অন্যান্য আয়াত বাদ দিলেও এখানের আয়াতগুলি খুবই স্পষ্ট। এখানে সুস্পষ্টতই বলা হয়েছে, যে সকল কাফির জনগোষ্ঠীর সাথে- তৎকালীন প্রেক্ষাপটে যে সকল কবীলা বা গ্রাম রাষ্ট্রের সাথে- তোমাদের চুক্তি রয়েছে তাদের মধ্যে যারা চুক্তি ভঙ্গ করে নি তাদের চুক্তি বহাল থাকবে। আর যারা চুক্তি ভঙ্গ করেছে তাদেরকে তোমাদের পক্ষ থেকে চুক্তি বাতিল ও কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দিয়ে চার মাসের সময় দাও। এ সময়ের মধ্যে তার যদি দীন গ্রহণ করে বা বশ্যতা গ্রহণ করে নিরাপত্তা প্রার্থনা করে তবে তাদেরকে নিরাপত্তা দিবে। অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ঘোষিত চারমাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করবে। তাদের বাহিনীকে যেখানে পাওয়া যাবে আক্রমন করা হবে এবং হত্যা বা বন্দী করা হবে।

[58] সূরা (৯) তাওবা: ১-৭ আয়াত

এখানে অযোদ্ধা মুশরিকদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয় নি। এ আয়াতের নির্দেশ পালনে কখনোই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অযোদ্ধা মুশরিকদেরকে পথে প্রান্তরে ধরে হত্যা করতে নির্দেশ দেন নি। এখানে মুশরিকগণ বলতে যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়া হলো সে সকল চুক্তিভঙ্গকারী মুশরিক জনগোষ্ঠী বা কবীরা রাষ্ট্রের যোদ্ধাদেরকে বুঝানো হয়েছে। এখানে প্রথমে, শেষে ও মাঝে বারংবার চুক্তিরক্ষাকারীদের চুক্তি রক্ষা করতে ও নিরাপত্তাপ্রার্থীদের নিরাপত্তা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বাকি সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতর্কিত বা গোপন আক্রমন না করে সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে চার মাসের সময় দেওয়া হয়েছে।

এ ঘোষণার উদ্দেশ্য যথাসম্ভব বেশি জিহাদ করে বেশি মুশরিক হত্যা করা নয়, বরং এ ঘোষণার উদ্দেশ্য জিহাদের প্রয়োজনীয়তা সীমিত করা এবং যত বেশি সম্ভব মানুষকে বাঁচানো। আধুনিক যুগেও আগ্রহী অযোদ্ধাদের সুযোগ দেওয়ার জন্য বা যুদ্ধরত রাষ্ট্র বা জনগোষ্ঠীর মনোবল দুর্বল করে যুদ্ধ এড়ানোর জন্য এরূপ ঘোষণা দেওয়া হয়। যে কোনো আন্তর্জাতিক ও মানবিক বিচারে যুদ্ধের জন্য এর চেয়ে মানবিক ও যৌক্তিক ঘোষনা হতে পারে না। আমরা পরে দেখব যে, বাইবেলীয় জিহাদের ক্ষেত্রে এরূপ কোনো নৈতিকতা রক্ষা করা হয় নি; বরং যে কোনোভাবে প্রতারণার মাধ্যমে যত বেশি সম্ভব শত্রু হত্যাই সেখানে মূল লক্ষ্য বলে গণ্য করা হয়েছে।

এভাবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণের প্রায়োগিক সুন্নাত থেকে আমরা নিশ্চিতরূপে বুঝতে পারি যে, কাফির-মুশরিককে হত্যার নির্দেশের অর্থ যুদ্ধের ময়দানে কাফির যোদ্ধা হত্যা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কখনোই বিচারে মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত বা যুদ্ধরত 'কাফির' ছাড়া অন্যদেরকে হত্যা করেননি। তার রাষ্ট্রে অগণিত কাফির সকল নাগরিক অধিকার নিয়ে বসবাস করেছেন। তিনি কখনোই তাদের হত্যা করেননি বা হত্যার অনুমতি দেন নি। ঈমানের দাবিদার মুনাফিকগণকে তিনি চিনতেন। তাদেরকেও হত্যার অনুমতি তিনি দেন নি। উপরন্তু তিনি অযোদ্ধা সাধারণ অমুসলিম নাগরিককে হত্যা কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন। ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "যদি কোনো ব্যক্তি মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিক বা অমুসলিম দেশের অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করে তবে সে জান্নাতের সুগন্ধও লাভ করতে পারবেন না, যদিও জান্নাতের সুগন্ধ ৪০ বৎসরের দুরত্ব থেকে লাভ করা যায়।"

আমরা পূর্ববর্তী হাদীসে দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) খারিজীদেরকে যখন যেখানে পাওয়া যায় হত্যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ থেকে সাহাবীগণ কখনোই ঢালাওভাবে "খারিজী" মতাবলম্বীদের যেখানে পাওয়া যায় হত্যা করার অনুমতি বুঝেন নি। বরং এ থেকে তাঁরা

যুদ্ধের ময়দানে খারিজী যোদ্ধাদেরকে হত্যার নির্দেশনা বুঝেছেন। খারিজীগণ অযোদ্ধা সাহাবী-তাবিয়ীগণ বা সাধারণ মুসলিমদের হত্যা করলেও সাহাবীগণ কখনোই যুদ্ধের ময়দান ছাড়া কোনোভাবে খারিজীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেননি বা তাদেরকে হত্যা করেননি। সমাজে তারা খারিজীদের সাথেএকত্রে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করেছেন।[বিস্তারিত দেখুন, আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, কুরআন সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা, পৃ. ৫৮২][59]

সন্ত্রাস এবং জংগিবাদ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে **'যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক আলী রীয়াজ'** বলেন, "এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য আসলে অনেক সময় শব্দগতভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে মৌলিক পার্থক্য আছে। জঙ্গি শব্দটা আপনি একাধিক ধরনের লোকজনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেন। কী অর্থে, কাদের আমরা জঙ্গি বলব? যারা এক ধরনের আগ্রাসী মনোভাব বা আচরণ করে। এই আগ্রাসী মনোভাব সহিংস নাও হতে পারে। অর্থাৎ সে সহিংস ঘটনা নাও ঘটাতে পারে। আর সন্ত্রাসী তাদের বলব যাদের সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে। তারা নির্বিচারে হামলা চালাচ্ছে এবং সহিংসতাকে তারা রাজনৈতিক একটা হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগাচ্ছে। যেমন ধরুন, বিদ্রোহী গোষ্ঠী। তাদের কি আমরা সন্ত্রাসী বলব? অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিন্তু তারা সন্ত্রাসী নয়। আবার জঙ্গি বলতে আমরা বিদ্রোহী বা সন্ত্রাসী দুই ধরনের লোককেই বোঝাব। সন্ত্রাসী হলো সুনির্দিষ্টভাবে, উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে যদি আমরা দেখি বেসামরিক লোকজনের উপর হামলা করা হচ্ছে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজনৈতিক। অনেক সময় এই দুটো আমরা গুলিয়ে ফেলি।"

"সন্ত্রাস বা সন্ত্রাসী এই শব্দটা আসলে ফরাসি বিপ্লব থেকে শুরু হয়েছে। আর জঙ্গি কথাটা জাং বা যুদ্ধ থেকে এসেছে। যারা যুদ্ধে লিপ্ত তাদের জঙ্গি বলা হতো। সময়ের ব্যবধানে এর অর্থেরও পরিবর্তন হয়ে যায়। আগে তো কোনো ঘটনা ঘটলেই তাদের সন্ত্রাসী বলা হতো। একজন মুক্তিযোদ্ধাও কারো দৃষ্টিতে সন্ত্রাসী। আসলে রাজনৈতিক বিষয়টা আলাদা করা হয়েছে। জাতীয় মুক্তির যে আন্দোলন সেটাকে তো আমরা সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বলে চিহ্নিত করব না। এখন কেউ কেউ করবে। কারণ তার একটা রাজনৈতিক অবস্থান আছে। সবকিছুই পরিবর্তন হচ্ছে। এখন দেখেন আমরা সহিংস উগ্রবাদের কথা বলছি।"

"সন্ত্রাসবাদ আর জঙ্গিবাদ মিলিয়ে ফেলার একটা কারণ হলো একেক দেশে একেকভাবে বর্ণণা করা হয় তো তার থেকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মিলিয়ে ফেরার কারণ পার্থক্য করার জন্য খুব বেশি তথ্য হয়ত হাতে নেই। কাঠামোগত দিকগুলো না জানাও একটা কারণ। যতক্ষণ

[59] ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ, পৃঃ ৫৪-৫৫

তথ্য জানা যাচ্ছে না, ততক্ষণ জঙ্গি বলে বর্ণণা করা হচ্ছে। সর্বশেষ সন্ত্রাসী শব্দটা ব্যবহৃত হতে গিয়ে এতবেশি ভুলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে যে, এখন অনেকেই এটা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেন। কারণ এতে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়।”

৩.১.৩ সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব

ইসলামে ‘জিহাদ’ কেবলমাত্র একটি ধর্মীয় পরিভাষা নয়; এটি একটি নৈতিক ও সামাজিক অবস্থান, যা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং ন্যায়ের পক্ষে দৃঢ়তায় দাঁড়ানোর নির্দেশ দেয়। ইতিহাস এবং সমকালীন বাস্তবতায় দেখা যায়, জিহাদের প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয় তখন, যখন সমাজ ও রাষ্ট্রিক কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়ে, মানুষ নিপীড়নের শিকার হয়, এবং মানবিক অধিকার হরণ করা হয়। ফলে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে জিহাদ একটি আবশ্যক নৈতিক দায়িত্বে পরিণত হয়—যদিও তা কেবল অস্ত্রধারী লড়াই নয়, বরং অনেক সময় শব্দ, যুক্তি, প্রতিবাদ ও সংগঠিত সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমেও সম্পন্ন হয়।

৩.১.৩.১ সামাজিক প্রেক্ষাপটে জিহাদের প্রয়োজনীয়তা

সমাজে যখন বৈষম্য, দারিদ্র্য, দুর্নীতি, যৌন নিপীড়ন, অন্যায় বিচার এবং ধর্মীয় ও জাতিগত দমন বাড়তে থাকে, তখন সে সমাজে ন্যায়ভিত্তিক জিহাদের গুরুত্ব বাড়ে। কুরআনের ভাষায়, “তোমরা কেন সেই সব দুর্বল, নির্যাতিত পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষ থেকে লড়াই করো না?” (সূরা আন-নিসা ৪:৭৫)। এই আয়াত স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়, নিপীড়িতদের পক্ষে দাঁড়ানোই প্রকৃত জিহাদ।

যেসব সমাজে শিক্ষার ঘাটতি, রাজনৈতিক অপব্যবহার এবং নৈতিক অবক্ষয় বেশি, সেখানে আত্মিক ও সামাজিক জিহাদ—অর্থাৎ জ্ঞানের চর্চা, সত্যের পক্ষে প্রতিবাদ, দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান—এসব হয়ে ওঠে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধকে অনেক মুসলিম পণ্ডিতই আত্মরক্ষামূলক জিহাদ হিসেবে অভিহিত করেছেন।[60]

৩.১.৩.২ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে জিহাদের প্রয়োজনীয়তা

রাজনৈতিক দিক থেকে, যখন কোনো রাষ্ট্র দমনমূলক হয়ে ওঠে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করে, বা জনগণের ওপর জুলুম চালায়, তখন ইসলাম সেই অন্যায় রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে

[60] Esposito, Unholy War, 2002

অবস্থান গ্রহণকে জিহাদ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। তবে এই জিহাদ হতে হবে শর্তসাপেক্ষ—সহিংস নয়, বরং প্রথমত নৈতিক, সাংগঠনিক ও শিক্ষামূলক।[61]

ইসলামের ইতিহাসে বহু বার জিহাদ একটি রাজনৈতিক প্রতিরোধের রূপ নিয়েছে—যেমন উসমান দান ফোদিওর ধর্মনির্ভর আন্দোলন (১৮০৪), কিংবা উপনিবেশবিরোধী মুসলিম লড়াই। তবে আধুনিক যুগে রাষ্ট্রশক্তি ও আন্তর্জাতিক আইনকে সম্মান করে যে জিহাদ, তা আত্মরক্ষা, ন্যায়ের দাবি এবং নৈতিক প্রতিবাদে সীমাবদ্ধ রাখাই ইসলামের নীতি।

জিহাদ রাজনৈতিক শুদ্ধতার দাবি তোলে, শাসকের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে চায়, এবং মানুষের অধিকার রক্ষায় এক বিকল্প নৈতিক প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে। সমাজতাত্ত্বিক খালেদ আবু আল-ফাদল তাই বলেন, “Jihad is, in essence, a moral labor to stand against all forms of tyranny.”।[62]

সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে জিহাদ একটি প্রয়োজনীয় বাস্তবতা, তবে এর ধরন ও প্রয়োগ হতে হবে সচেতন, ন্যায়ের ভিত্তিতে, এবং সহিংসতামুক্ত। আজকের বিশ্বে যেখানে অন্যায়, নিপীড়ন ও দমন প্রায়ই রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্য দিয়েই সংঘটিত হয়, সেখানে ইসলামী জিহাদ—তার প্রকৃত আধ্যাত্মিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে—একটি নৈতিক জবাব হতে পারে। ভুল ব্যাখ্যা নয়, বরং সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরিচালিত এই সংগ্রামই হতে পারে সমাজ পরিবর্তনের একটি টেকসই পথ

[61] Al-Qaradawi, Yusuf. Fiqh al-Jihad. Maktabat Wahbah, 2009

[62] The Great Theft, 2005

৪. ইসলামিক পণ্ডিতের মতামত ও সমকালীন দৃষ্টিভঙ্গি

জিহাদ বিষয়ে সমাজে এমন অনেক ভুল ধারণা প্রচলিত, যা ইসলামের মূল শিক্ষা ও পণ্ডিতদের ব্যাখ্যার সঙ্গে একেবারে সাংঘর্ষিক। অনেক সময় এই বিভ্রান্ত ধারণাগুলোর উৎস হচ্ছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রসূত অপপ্রচার, অজ্ঞতা, বিকৃত ধর্মীয় বক্তব্য এবং কখনো কখনো চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলোর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব্যাখ্যা।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করো কুরআনের মাধ্যমে..." [63]

এখানে কোনো অস্ত্র বা যুদ্ধের কথা বলা হয়নি—বরং বলা হয়েছে, জিহাদ মানে সত্যের কথা বলা, যুক্তি দিয়ে ইসলামের বাণী প্রচার করা। মহানবী (সা.)-এর জীবনের মক্কা পর্বে জিহাদ মানে ছিল ধৈর্য, সহনশীলতা আর নৈতিক দৃঢ়তা। পরবর্তীতে মদিনা পর্বে যখন মুসলিমরা আক্রমণের শিকার হয়, তখন আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধকে জিহাদ বলা হয়, আর সেটাকেই 'কিতাল' বলা হয়েছে।

নবী করিম (সা.)-এর একটি প্রসিদ্ধ হাদীসে বলা হয়েছে, "আমরা ছোট জিহাদ (অস্ত্রের যুদ্ধ) থেকে ফিরে এসেছি, এখন আমাদের অপেক্ষা করছে বড় জিহাদ—নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ।" (বায়হাকী, "আল-যুহদ", হাদীস ৩৮২) এখান থেকে বোঝা যায়, বড় জিহাদ মানে হলো নিজের মনের লোভ, হিংসা, অহংকার ও অন্যায় চাওয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করা।

ইমাম গাযযালী, ইমাম ইবনে তাইমিয়া, এবং সমকালীন পণ্ডিত ইউসুফ আল-কারযাভি (Fiqh al-Jihad, 2009) সবাই বলেন—জিহাদ মানেই অস্ত্রধারণ নয়। বরং আত্মশুদ্ধি, অন্যায়ের প্রতিবাদ, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, এমনকি জ্ঞানচর্চাও এক ধরনের জিহাদ।

কিন্তু দুঃখজনকভাবে, কিছু উগ্র মতবাদ ও চরমপন্থী গোষ্ঠী এই জিহাদ শব্দটাকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করছে। তারা নিরীহ মানুষকে হত্যা করে, নারী ও শিশুকে টার্গেট করে, এবং বলে যে এটা "জিহাদ"! অথচ ইসলাম তা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করেছে। কুরআনে স্পষ্ট বলা হয়েছে, "তোমরা সীমা লঙ্ঘন কোরো না, আল্লাহ সীমা লঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না" (সূরা আল-বাকারা, ২:১৯০)।

---

[63] সূরা আল-ফুরকান, ২৫:৫২

এমনকি, ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিকের (রাহিমাহুমুল্লাহ) মতো বড় ফিকহবিদরা বলেছেন—যুদ্ধ শুধু তখনই বৈধ, যখন সেটা আত্মরক্ষার জন্য হয় এবং বৈধ শাসক তার অনুমতি দেয়।

৪.১ ঐতিহাসিক ইসলামী মনীষীদের ব্যাখ্যা

ফিরোযাবাদী বলেন, الجهاد শব্দটি শত্রুর সাথে যুদ্ধ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়।[64] যেমন আল্লাহ বলেন, وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جهاده 'তোমরা আল্লাহর জন্য জিহাদ কর, যেমন জিহাদ করা উচিত' (হজ্জ ৭৮)।

ইবনু ফারেস (রহঃ) বলেন, জিহাদ শব্দটি থেকে নির্গত, যার অর্থ হচ্ছে المشقة (কষ্ট, ক্লেশ)। আর এ অর্থে শব্দটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। যেমন বলা হয়, جهدت نفسي وأجهدت (আমি পরিশ্রম করেছি এবং আমি সক্ষম হয়েছি)। এখানে الجهد অর্থ শক্তি-সামর্থ্য। আল্লাহ বলেন, والذين لا يُجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُم 'আর তাদের প্রতি যাদের কিছুই নেই শুধুমাত্র নিজের পরিশ্রম লব্ধ বস্তু ছাড়া' (তওবা ৭৯)।

পারিভাষিক অর্থে দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও দ্বীনকে সমুন্নত করার জন্য আল্লাহর পথে শক্তি-সামর্থ্য প্রয়োগ করে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং দ্বীনের সার্বিক সহযোগিতা করা। অর্থাৎ আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

The Noble Qur'an-এ জিহাদের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে- Holy fighting in the cause of Allah or any other kind of effort to make Allah's word (Islam) superior. 'আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পবিত্র যুদ্ধ কিংবা আল্লাহর কালাম (ইসলামকে) প্রতিষ্ঠিত করতে যে কোন প্রচেষ্টা'।"[65]

ওলামায়ে কেরাম জিহাদের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উপস্থাপন করা হ'ল-

---

64 মাজদুদ্দীন ফিরোযাবাদী, আল-কামুসুল মুহীত, ২য় খণ্ড (মিসর। আল-মাতবাআতুল মিসরিয়্যাহ, ১৯৩৩ খৃঃ), পৃঃ ২৮৬

65 The Noble Qur'an, Translated by Dr. Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali & Dr. Muhammad Muhsin Khan (Madinah: King Fahd Complex for the printing of the Holy Qur'an, 1404 H.), p. 871

(১) আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহঃ) বলেন, ‘‘সাধারণভাবে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অর্থেই প্রাধান্য লাভ করেছে। আর এটা হচ্ছে দ্বীনে হক্বের প্রতি কাফেরদের দাওয়াত দেওয়া এবং কবুল না করলে তাদের সাথে যুদ্ধ করা’।’[66]

(২) আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন الجهاد في الشرع بذل الجهد في قتال الكفار ‘শারঈ পরিভাষায় জিহাদ হচ্ছে, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা চালানো’।’[67]

(৩) হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, ‘জিহাদ হচ্ছে কাফিরদের সাথে যুদ্ধে প্রচেষ্টা ব্যয় করা’।’[68]

(৪) আল-কাশানী (রহঃ) বলেন, هو الدعوة إلى الإسلام وإعلاء الدين ودفع شر الكفار وقهرهم ‘জিহাদ হচ্ছে ইসলামের দিকে আহ্বান, দ্বীনকে সুউচ্চ (প্রতিষ্ঠিত) করা, কাফেরদের অনিষ্ট প্রতিহত করা এবং তাদের দমন করা’।’[69]

(৫) শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, الجهاد هو بذل الوسع وهو القدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق. ‘‘প্রচেষ্টা এবং তাঁর অপছন্দনীয় বস্তু প্রতিরোধে শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করা’।’’

(৯) ড. ওয়াহবাতুয যুহাইলী বলেন, ‘জিহাদ হচ্ছে প্রচেষ্টা চালানো বা শ্রম ব্যয় করা এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রথমত প্রতিরক্ষা করা। অতঃপর দাঈদের হেফাযত ও দেশ রক্ষার স্বার্থে প্রয়োজনে যুদ্ধ-সংগ্রামের শরণাপন্ন হওয়া; যাতে মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হয়, যার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। আর এক্ষেত্রে পরিচালিত সকল প্রচেষ্টা হতে হবে একমাত্র আল্লাহ্র রাস্তায় এবং শুধু তাঁরই সন্তুষ্টি বিধান ও রেযামান্দি হাছিলের উদ্দেশ্যে’।[70]

৪.২ ফাতওয়া ও ধর্মীয় নেতৃত্বের ভূমিকা

যেহেতু এ বিষয়টির সাথে ধর্মীয় অনুভূতি জড়িত সেহেতু এর প্রতিরোধ, প্রতিকার ও নিয়ন্ত্রণে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ বা আলিমদের সম্পৃক্ত করা অতীব জরুরী। উগ্রতার প্রসারে ইসলামী শিক্ষার

---

66 ইবনুল হুমাম, ফাৎহুল কাদীর, ৫ম খণ্ড, (কোয়েটা আল-মাকতাবাতুল হালাবিয়া, তা.বি.), পৃঃ ১৮৭-৮৮

67 ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৪, টাকা নং- ১

68 ফাৎহুল বারী, ৬৪ খণ্ড, পৃঃ ৩

69 আল-কাশানী, কিতাবুল বাদায়ে ওয়াছ ছানায়ে ফি তারতীবিশ শারায়ে, ৭ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল কিতাবিল আরাবী, তা.বি.), পৃঃ ৯৮।

70 ড. আবদুর রহমান ইবনু মা'লা আল-লুআইহিক্ব, আল-ইরহাব ওয়াল গুলু, আল-ফুরক্বান (কুয়েত: এপ্রিল ২০০৮), ৪৮৭ তম সংখ্যা, পৃঃ ৩৯।

যে বিষয়গুলিকে বিকৃত করা হয় সেগুলির তাত্বিক বিশে¬ষণ ও পর্যালোচনার জন্য সমাজের প্রাজ্ঞ আলিমগণকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গণমাধ্যমে সুযোগ দেওয়া অতীব জরুরী। একজন রাজনৈতিক বা সামাজিক নেতা যদি বলেন ‘‘ইসলাম শান্তির ধর্ম... ইত্যাদি’’ তাতে সন্ত্রাসে লিপ্ত যুবক পরিতৃপ্ত বা ‘কনভিন্সড’ হবে না; তবে যদি একজন প্রাজ্ঞ নেককার আলিম এ বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা করেন তাহলে তা হয়ত তাকে পরিতৃপ্ত বা ‘কনভিন্সসড’ করতে পারবে।

এতে যেমন সংশ্লিষ্ট অনেকে সংশোধিত হবে তেমনি নতুন অর্ন্তভুক্তি কমে যাবে। ইসলামের ধর্মীয় ব্যবস্থার মধ্যে আল্লাহ ব্যক্তি ও সমাজ সংশোধনের স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা রেখেছেন। এর অন্যতম হলো মসজিদ ও সালাতুল জুমুআ। জুমুআর খুতবা ও আলোচনা সাধারণভাবে মুমিনের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করে। সকল ব্যক্তিগত ও সামাজিক অপরাধ ও অবক্ষয়ের ন্যায় জঙ্গিবাদ বা উগ্রতা রোধেও ইমামগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। এজন্য মসজিদগুলিতে যোগ্য ইমাম নিয়োগ দেওয়া এবং বিদ্যমান ইমামদের ধর্মীয় জ্ঞান ও যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন। সরকার যদি নিয়ন্ত্রণের নামে ইমামদের কথা বলা বন্ধ করেন তাহলে তা কোনো ভাল ফল দিবে না; বরং উল্টো ফল দিবে। ইমামগণ যদি সামাজিক অন্যায়, অবক্ষয় ইত্যাদির বিরুদ্ধে কিছু না বলে শুধুই ফযীলত ও গল্পের ওয়ায করেন তাহলে জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণে কোনো লাভ হবে না। ইমামগণ যদি সমাজ বা সরকারের অন্যায়ের কোনো প্রতিবাদ না করে শুধু উগ্রতার নিন্দা করেন তাহলেও তা মানুষের মনে রেখাপাত করবে না। কেউ একপেশে কথা পছন্দ করেন না এবং তাতে প্রভাবিত হন না।

ইমামগণ যদি সামাজিক অন্যায়, অবক্ষয়, অশ্লীলতা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সুন্নাত-সম্মত পদ্ধতিতে কথা বলেন, এগুলির বিরুদ্ধে আপত্তি ও প্রতিবাদের সুন্নাত-সম্মত পদ্ধতি জানিয়ে দেন, উগ্রতা, বলপ্রয়োগ, আইন অমান্য ও বিদ্রোহের কারণে মুমিন দুনিয়া ও আখিরাতে কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং দীনী দাওয়াত কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিভিন্ন আঙ্গিকে তার তথ্যভিত্তিক আলোচনা করেন তাহলে তা খুবই ভাল ফল দিবে।[71]

জঙ্গিবাদে যেহেতু ইসলামের নাম ব্যবহার করা হচ্ছে সেহেতু এর নিয়ন্ত্রণে আলিম, ইমাম, আল্লাহর পথে দাওয়াতের লিপ্ত ব্যক্তি বা ‘‘দায়ী ইলাল্লাহ’’ এবং ধার্মিক মুসলিমদের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। একথা সত্য যে, সাম্রাজ্যবাদ ও আগ্রাসন বিরোধী স্বাধীকার আন্দোলনকে জঙ্গিবাদ নাম দেওয়া হচ্ছে এবং জঙ্গিবাদের ধুয়া তুলে সারাবিশ্বে ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষাকে

[71] ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ, পৃঃ ১১২

নিন্দিত করার অপচেষ্টা করা হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি নিজেদের প্রয়োজনে 'জঙ্গি' তৈরি করেছে এবং তাদের কর্মকান্ডের জন্য ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষাকে দায়ী করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। পাশাপাশি একথাও সত্য যে আমাদের দেশে ও বিভিন্ন দেশে কিছু মানুষ ইসলাম প্রতিষ্ঠা, ইসলামী রাষ্ট্র বা বিচার প্রতিষ্ঠা, অন্যায় প্রতিরোধ, অন্যায়কারীর শাস্তি ইত্যাদি ইসলাম-নির্দেশিত কর্মের নামে ইসলামনিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হচ্ছেন। এদের বিভ্রান্তি দূর করার মূল দায়িত্ব আলিম ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের। জঙ্গিবাদের জন্য পাশ্চাত্যকে, সাম্রাজ্যবাদী প্রচারণাকে বা ইসলামের শত্রুদেরকে দায়ী করে বক্তব্য দিলেই সব দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। পাশাপাশি বিভ্রান্তির তাত্ত্বিক পর্যালোচনা প্রয়োজন। ইসলামের নামে উগ্রতা বা সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে লিপ্ত সকলেই অমুসলিমদের এজেন্ট বা ক্রীড়ানক বলে মনে করার কারণ নেই। এদের মধ্যে কেউ এমন থাকলেও অন্য অনেক মানুষ রয়েছেন যারা দীনী আবেগ নিয়ে সাওয়াবের ও নাজাতের উদ্দেশ্যে উগ্রতা, সহিংসতা ও খুনখারাপিতে লিপ্ত হচ্ছেন। এদেরকে সঠিক জ্ঞান প্রদান ও বিভ্রান্তি অপনোদনের দায়িত্ব আলিম সমাজের। ইসলামী শিক্ষার বিকৃতি রোধ করার পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণের সুন্নাত অনুসারে ন্যায়ের আদেশ, অন্যায়ের নিষেধ ও দীনী দাওয়াতকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সঠিক পথের নির্দেশনা দেওয়া আলিমগণের দায়িত্ব।[72]

আলিম-উলামা, পীর-মাশাইখ ও ''দায়ী''-গণের পারস্পরিক শত্রুতা, বিচ্ছিন্নতা, দলাদলি ও গালাগালিতে দীনের শত্রুদের ছাড়া আর কারো কল্যাণ হচ্ছে বলে আমরা দেখছি না। এরূপ বিভক্তির কারণে একদিকে যেমন ইসলামের দাওয়াত ব্যাহত হচ্ছে এবং দীনের বিরুদ্ধে অপপ্রচার হচ্ছে, অপরদিকে সমাজের অনেক আবেগী যুবক মূলধারার আলিম-উলামা ও পীর-মাশাইখদের বিষয়ে হতাশা ও কুধারণা পোষণ করে উগ্রতার আহবানকারীদের ক্ষপ্পরে পড়ে যাচ্ছে।[73]

পতন ও অবক্ষয়ের যুগগুলিতে বিভক্তি ও দলাদলির এ অবস্থা থেকেছে। ক্রুসেড ও তাতার যুদ্ধের সময় শিয়া-সুন্নী, হানাফীশাফিয়ী, শাফিয়ী-হাম্বলী এরূপ হানাহানি চলেছে। বিবাদমান বিভিন্ন দল ক্রুসেডার বা তাতারদের বুঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, আমরা আপনাদের পক্ষের শক্তি, আমাদের প্রতিপক্ষরাই আপনাদের শত্রু, কাজেই তাদের ঘায়েল করুন। কিন্তু ক্রুসেডার বা তাতারগণ যখন হত্যাকান্ড চালিয়েছেন তখন পক্ষ-বিপক্ষ বিচার করেননি, সকল পক্ষের সকল মুসলিম নারী-পুরুষকে নির্বিচারে হত্যা করেছেন।

---

72 ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ, পৃঃ ১১৩

73 ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ, পৃঃ ১১৪

বর্তমানে বোসনিয়া, ইরাক, আফগানিস্তান, সোমালিয়া ও অন্যান্য দেশে আমরা একই অবস্থা দেখতে পাই। আলিমগণ একে অপরকে খারাপ বলেছেন। আর দখলদার বাহিনী তাদের বোমাবর্ষণ ও গণহত্যাযজ্ঞে সকলকে নির্বিচারে হত্যা করেছেন, কে কোন্ মতের তা যাচাই করছেন না।[74]

এ বিভক্তি ও দলাদলি দুঃখজনক হলেও এজন্য হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। এর মধ্য দিয়েই দীনী দাওয়াত এগিয়ে চলেছে ও চলবে। আমাদেরকেও দাওয়াত এগিয়ে নিতে হবে। আমরা হয়ত উম্মাতের এ বিভক্তি দূর করতে পারব না, তবে আমাদের দ্বারা যেন কোনো অবস্থাতেই উম্মাতের বিভক্তি ও বেদনা বৃদ্ধি না পায়। আমরা অনেক সময় ঐক্যের কথা বলি, তবে আমাদের বিভিন্ন মতবাদ আমাদের অজ্ঞাতসারেই অনৈক্য ও উগ্রতা উস্কে দেয়। এর অন্যতম বিষয় হলো 'নিজেদের কর্ম বা কর্মপদ্ধতিকে' একমাত্র ''সঠিক'' বা একমাত্র ''পরিপূর্ণ'' বলে দাবি করা।

অতীতে ও বর্তমানে আমাদের দেশে ও সকল মুসলিম দেশে ইসলামী দাওয়াতের দায়িত্ব বিভিন্নভাবে পালিত হয়েছে ও হচ্ছে। তন্মধ্যে চারটি ধারা উল্লেখযোগ্য: (১) শিক্ষা বিস্তার, (২) গণ-দাওয়াত, (৩) দরবার-খানকা ও (৪) রাজনীতি। এ চারটি ধারার মাধ্যমে সকলেই একটি ইবাদতই পালন করছেন, যার নাম ''আল্লাহর পথে দাওয়াত''। প্রত্যেকে নিজের পদ্ধতিকে উত্তম প্রমাণ করার জন্য বিভিন্ন দলীল প্রমাণ পেশ করতে যেয়ে এমন ধারণা দিচ্ছেন যে, তার পদ্ধতির বাইরের পদ্ধতিগুলিতে যারা এ ইবাদত পালন করছেন তাদের ইবাদত হচ্ছে না বা কম মানের হচ্ছে। এভাবে মানের কারণে নয়, শুধু পদ্ধতির কারণে অন্যের কর্মকে অবমূল্যায়ন করার ফলে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ অপসারিত হচ্ছে, দলাদলি ও গালাগালি বৃদ্ধি পাচ্ছে, পারস্পরিক সহনশীলতা কমছে, উগ্রতা বাড়ছে এবং উগ্রতার পটভূমি প্রসারিত হচ্ছে। সর্বোপরি এভাবে বিচ্ছিন্নতা স্থায়ী হচ্ছে এবং উগ্রতা ও অন্যান্য অবক্ষয় রোধে ঐক্যবদ্ধ ইজতিহাদের সম্ভাবনা রহিত হচ্ছে।[75]

পূর্বের আলোচনায় আমরা জঙ্গিবাদ, চরমপন্থা, সন্ত্রাস ও উগ্রতার পরিচয় এবং ইসলামের নামে উগ্রতা বা সহিংসতার কারণ ও প্রেক্ষাপট আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, সকল ধর্ম ও আদর্শের অনুসারীরাই বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে সন্ত্রাস বা জাঙ্গিবাদে লিপ্ত হয়েছে ও হচ্ছে। সন্ত্রাস অর্থই রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে অস্ত্রধারণ ও শক্তি প্রয়োগ এবং বিশেষত অযোদ্ধা ব্যক্তি বা বস্তুকে আঘাত করা বা হত্যা করা। ইসলামে সন্ত্রাসের পথ সামগ্রিকভাবে রুদ্ধ করা

74 ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ, পৃঃ ১১৪

75 ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ, পৃঃ ২৫৫-২৫৮

হয়েছে। ইসলামে মানব জীবনকে সর্বোচ্চ সম্মানিত বলে গণ্য করা হয়েছে এবং একমাত্র বিচার ও যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনোভাবে কোনো মানুষকে হত্যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে বিচার ও যুদ্ধ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এভাবে ইসলামে সন্ত্রাসের পথ পরিপূর্ণভাবে রুদ্ধ করা হয়েছে। ইসলামের ইতিহাসে আমরা সন্ত্রাসের ঘটনা দেখতে পাই না বললেই চলে। কিন্তু সমকালীন বিশ্বে উপনিবেশোত্তর বিভিন্ন মুসলিম দেশের দমন-পীড়ন নীতি, ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও অন্যান্য স্থানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য বিশ্বশক্তির সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী নীতি, সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে মুসলিম নিধন ও মুসলিম সমাজের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ, আবার প্রয়োজনে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য মুসলমানদের ধর্মীয় আবেগ অপব্যবহার করে ‘‘মুজাহিদ’’ তৈরির উদ্দেশ্যে বিশেষ ‘‘মাদ্রাসা’’ তৈরি করে তাদেরকে জঙ্গিতে রূপান্তরিত করা ইত্যাদি বিষয় বিভিন্নভাবে উগ্রতা, জঙ্গিবাদ বা সন্ত্রাসের জন্ম দিয়েছে। এক্ষেত্রে উগ্রতা, সন্ত্রাস বা জাঙ্গিবাদের প্রচার ও প্রসারের জন্য ইসলামের বিভিন্ন শিক্ষাকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের জনগণ প্রকৃতিগতভাবে শান্তিপ্রিয়। এদেশে কখনো ধর্মীয় সংঘাত ও রক্তারক্তি দেখা দেয় নি। ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান বা অন্যত্র যেমন বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে এবং একই ধর্মের বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রুপ ও দলের মধ্যে হানাহানি ও রক্তারক্তির ঘটনা ঘটে থাকে বাংলাদেশে তা কখনোই ঘটে না। কিন্তু ইদানিং আমরা আমাদের দেশেও ধর্মীয় উগ্রতার উন্মেষ লক্ষ্য করছি। এ প্রবণতা রোধে আমাদের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। [76]

[76] ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ, পৃঃ ২৪৭-২৪৮

৫. মুসলিম সমাজে 'জিহাদ' বিষয়ক সচেতনতা ও শিক্ষার প্রভাব

'জিহাদ' শব্দটি সময়ের সঙ্গে এবং রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রভাবের কারণে এটি অনেক ক্ষেত্রে ভুলভাবে বোঝা ও প্রচারিত হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে মুসলিম সমাজে জিহাদ বিষয়ক সচেতনতা ও শিক্ষার উপস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সঠিক শিক্ষা যেমন আত্মশুদ্ধি ও সমাজকল্যাণে সহায়তা করে, তেমনি অজ্ঞতা বা বিকৃত ধারণা চরমপন্থা ও বিভ্রান্তির জন্ম দেয়।

সচেতনতা ও শিক্ষা থাকলে মুসলিম সমাজ জিহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য—আত্মসংযম, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের পক্ষে থাকা, নিপীড়িতের পাশে দাঁড়ানো এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান—এগুলো সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারে। যেমন, কুরআনে (সূরা আল-ফুরকান ২৫:৫২) বলা হয়েছে, "তুমি কুরআনের মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর জিহাদ করো", যেখানে অস্ত্র নয়, যুক্তি, জ্ঞান ও সত্যের ভাষাকে জিহাদের মাধ্যম বলা হয়েছে।

যেসব মুসলিম সমাজে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্কুল-কলেজ এবং গণমাধ্যমে জিহাদ বিষয়ে ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষা দেওয়া হয়, সেখানে ধর্মব্যবস্থাকে সহিংসতা নয়, বরং নৈতিক ও মানবিক উন্নয়নের উপায় হিসেবে দেখা হয়। এর ফলে যুবসমাজ আত্মিকভাবে পরিপক্ব হয়, এবং ধর্মকে ব্যবহার করে সহিংস আন্দোলন বা উগ্রবাদীদের প্ররোচনায় পড়ে না।

এর বিপরীতে, যেখানে জিহাদ বিষয়ক সঠিক আলোচনা অনুপস্থিত বা বিকৃত, সেখানে দেখা যায় ধর্মের নামে চরমপন্থা, উগ্র চিন্তা ও সহিংসতার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। অনেক সময় সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘৃণাপূর্ণ প্রচারণা বা ভুল অনুবাদের মাধ্যমে তরুণদের ধর্মীয় অনুভূতিকে ব্যবহার করে জঙ্গিবাদে প্রলুব্ধ করা হয়। এ প্রসঙ্গে গবেষক জেসিকা স্টার্ন বলেন, "When moral certainty meets religious ignorance, extremism thrives"।[77]

জিহাদ বিষয়ে সঠিক শিক্ষা কেবল ধর্মীয় পরিপূর্ণতা নয়, বরং সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রেও কার্যকর। কারণ, এটি ধর্মভিত্তিক সহনশীলতা, মানবিক মূল্যবোধ, এবং বহুসংস্কৃতির সঙ্গে মিলেমিশে থাকার চেতনা গড়ে তোলে। তদুপরি, আলেম, শিক্ষাবিদ ও পরিবারের সমন্বিত ভূমিকার মাধ্যমে এই শিক্ষা সমাজের সবস্তরে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। এ ক্ষেত্রে

[77] Stern, Jessica. Terror in the Name of God: Why Religious Militants Kill. HarperCollins, 2003

সমকালীন পণ্ডিত ইউসুফ আল-কারযাভি জোর দেন, যে জিহাদ শিক্ষাকে সমাজকেন্দ্রিক, শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়ের ধারায় পুনর্বিন্যস্ত করতে হবে।[78]

সুতরাং, মুসলিম সমাজে জিহাদ বিষয়ক সচেতনতা ও সঠিক শিক্ষা কেবল একটি ধর্মীয় কর্তব্য নয়, বরং একটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক চেতনার আধার। এই চেতনার প্রসারই পারে মুসলিম সমাজকে আত্মনির্ভর, শান্তিপ্রিয় ও চরমপন্থামুক্ত একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাজে পরিণত করতে।

৫.১ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মাদ্রাসার পাঠ্যক্রম

"জিহাদ" শব্দটা আমরা অনেকেই শুনেছি। কিন্তু বাস্তবে এর মানে কী—তা সবাই ঠিকমতো জানি না। কেউ ভাবে জিহাদ মানেই যুদ্ধ, আবার কেউ ভাবে এটা উগ্রবাদীদের কাজ। অথচ কুরআন-হাদীস অনুযায়ী, জিহাদ মানে হলো ন্যায়ের পক্ষে থাকা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে চেষ্টা করা। এটা আত্মসংযম, ধৈর্য ও নৈতিকতার চর্চা। এখন এই বিষয়টা ভুলভাবে উপস্থাপন হওয়ায়, অনেক তরুণ বিভ্রান্ত হচ্ছে। কেননা, তাদের পাঠ্যক্রমে জিহাদ সংক্রান্ত কোনো অধ্যায়ই নেই। তাই স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় আর বিশেষ করে মাদ্রাসার পাঠ্যক্রমে জিহাদ নিয়ে পরিষ্কার, প্রামাণ্য এবং বাস্তবধর্মী শিক্ষা থাকা খুব দরকার।

ডেভিড কুকের মতে, জিহাদ শুধু যুদ্ধ নয়—এটা অনেক রকম হতে পারে। যেমন:

> **১. আত্মসংগ্রাম (জিহাদ আল-নাফস)**: নিজের খারাপ অভ্যাস, লোভ, রাগের বিরুদ্ধে চেষ্টা করা।
>
> **২. বুদ্ধিবৃত্তিক জিহাদ**: যুক্তি, তর্ক আর জ্ঞানের মাধ্যমে অন্যায় বা ভুল ব্যাখ্যার বিরোধিতা করা।
>
> **৩. সশস্ত্র জিহাদ**: যখন কোনো বৈধ সরকার মুসলিমদের রক্ষা করতে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করে, তখন সেটা বৈধ জিহাদ।[79]

জিহাদ শুধু ধর্মীয় বিষয় নয়—এটা ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, রাজনীতি সবকিছুর সঙ্গেই জড়িত। তাই স্কুল-মাদ্রাসার পাঠ্যক্রমে এমনভাবে বিষয়টি পড়ানো উচিত যাতে শিক্ষার্থীরা বুঝতে

---

[78] Al-Qaradawi, Yusuf. Fiqh al-Jihad. Cairo: Maktabat Wahbah, 2009

[79] Cook, David. Understanding Jihad (2005)

পারে, জিহাদ মানে শুধু যুদ্ধ নয়, বরং এটা সমাজ ও নিজের ভেতরের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।[80]

মাদ্রাসায় সাধারণত কুরআন ও হাদীসের পাঠ হয়। তবে অনেক সময় কিছু আয়াত বা হাদীসের একপেশে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। যেমন, কুরআনের ২:১৯০ আয়াতে বলা হয়েছে— "যুদ্ধ করা যাবে, তবে তা হবে আত্মরক্ষামূলক, অন্যায়ভাবে নয়। এসব ব্যাখ্যা স্পষ্টভাবে দিলে শিক্ষার্থীরা উগ্র মতবাদে না গিয়ে শান্তিপূর্ণ ইসলামের শিক্ষায় বিশ্বাস করবে"।[81]

জিহাদ নিয়ে ভুল ধারণা দূর করতে হলে স্কুল-মাদ্রাসায় নিয়মিত আলোচনা, ওয়ার্কশপ, ডিবেট আর ভিডিও প্রেজেন্টেশন করা দরকার। এতে শিক্ষার্থীরা নিজেই প্রশ্ন করতে পারবে, ভাবতে পারবে, বুঝতে পারবে কোনটা সত্য আর কোনটা অপপ্রচার।[82]

বেশিরভাগ ইসলামি বই আরবি বা উর্দু ভাষায় হওয়ায় অনেকেই ভালোভাবে বুঝে না। তাই বাংলায় ও ইংরেজিতে সহজ ভাষায় কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা ও গবেষণা-ভিত্তিক লেখা দরকার, যাতে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে জিহাদ মানে কী। অনেক সময় শিক্ষার্থীরা জিহাদের বিষয়টিকে ধর্মীয় যুদ্ধ বা ধর্মের জন্য যুদ্ধ বা অমুসলিম নিধনের যুদ্ধ বলে ভেবে থাকে। যুগোপযোগী লেখনি উপস্থাপন করে তাদের ভুল ধারণা গুলো দূর করা যেতে পারে।[83]

৫.২ জিহাদ সম্পর্কে যুব সমাজের ধারণা

ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক অর্থবহ একটি ধারণা হলো 'জিহাদ'। কুরআন ও হাদীসের আলোকে এটি মূলত আত্মসংযম, নৈতিক উন্নয়ন ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামের নাম। কিন্তু দুঃখজনকভাবে, সমকালীন মুসলিম যুবসমাজের এক বড় অংশের কাছে এই গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ধারণাটি বিভ্রান্তিকর ও ভুলভাবে বোধগম্য হয়ে উঠেছে। কেউ কেউ একে অস্ত্রধারী যুদ্ধের নাম মনে করে, আবার কেউবা এটিকে ন্যায়ের প্রতীক হিসেবে ধরে নেয়—যা প্রায়শই সহিংস ও চরমপন্থার পথেই পরিচালিত হয়। এই বিভ্রান্তির পেছনে রয়েছে একাধিক জটিল ও পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত কারণ, যার মধ্যে মিডিয়া প্রভাব, শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতা, ধর্মীয় অজ্ঞতা ও রাজনৈতিক অপব্যবহার বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

[80] Peters, Rudolph. Jihad in Classical and Modern Islam (1996)

[81] Al-Qaradawi, Yusuf. Fiqh al-Jihad (2009)

[82] International Crisis Group (2007)

[83] Esposito, John L. Unholy War: Terror in the Name of Islam (2002)

সমসাময়িক বিশ্বে গণমাধ্যম, বিশেষ করে পশ্চিমা মিডিয়া, দীর্ঘদিন ধরে জিহাদ শব্দটিকে সহিংসতার সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। এই প্রচারণার ফলে অনেক মুসলিম তরুণ মনে করে যে জিহাদ মানেই 'হলি ওয়ার' বা পবিত্র যুদ্ধ। হলিউডের চলচ্চিত্র, পশ্চিমা সংবাদমাধ্যম এবং আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বর্ণনায় মুসলিম চরিত্রগুলোকে প্রায়ই সন্ত্রাসী ও যুদ্ধপ্রিয় হিসেবে তুলে ধরা হয়। Edward Said তার বিখ্যাত বই Covering Islam (1997)-এ দেখিয়েছেন, কীভাবে পশ্চিমা মিডিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলামকে একটি হুমকি হিসেবে চিত্রিত করে, যা জিহাদকে একরকম ভয়ংকর প্রতীকে রূপান্তর করেছে।[84]

অন্যদিকে, কিছু তরুণ যারা নিজেদের জীবনে বৈষম্য, বঞ্চনা বা রাজনৈতিক নিপীড়নের শিকার—তারা জিহাদকে প্রতিবাদের মাধ্যম হিসেবে দেখতে শুরু করে। কিছু উগ্রবাদী গোষ্ঠী এই আবেগকে কাজে লাগিয়ে তরুণদের ন্যায়বিচারের নামে সহিংসতায় উদ্বুদ্ধ করে। Jessica Stern তার বই Terror in the Name of God (2003)-এ বিশ্লেষণ করেছেন, কীভাবে ধর্মীয় ভাষ্যকে চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলো রাজনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত করে এবং কিভাবে তরুণদের আবেগকে ব্যবহার করে নিজেরা স্বার্থ হাসিল করে। এটি প্রমাণ করে, ধর্মীয় অজ্ঞতা থাকলে তরুণদের মধ্যে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য করার ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে।[85]

আরেকটি বড় সমস্যা হলো—শিক্ষা ব্যবস্থায় জিহাদ বিষয়ক স্পষ্ট, গভীর ও কুরআনভিত্তিক ব্যাখ্যার অভাব। অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তকে হয় জিহাদ বিষয়ে কিছুই বলা হয় না, অথবা এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আরও বিভ্রান্তি তৈরি হয়। ফলত, তারা সোশ্যাল মিডিয়া বা ইন্টারনেট থেকে বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা সংগ্রহ করে। David Cook-এর Understanding Jihad (2005) বইয়ে এই বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে—"ধর্মীয় শিক্ষার অভাবে কিভাবে তরুণরা ভ্রান্ত তথ্য দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং কিভাবে জিহাদের প্রকৃত তাৎপর্য থেকে দূরে সরে যায়"।[86]

তাছাড়া, ইতিহাসের ধারায় বহুবার রাজনৈতিক নেতারা ও ধর্মীয় গোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থে জিহাদের ব্যাখ্যা পরিবর্তন করেছেন। বিশেষ করে উসমান দান ফোদিও থেকে শুরু করে আধুনিক জঙ্গিগোষ্ঠী পর্যন্ত, জিহাদকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এর

---

[84] Said, E. 1997. Covering Islam

[85] Stern, J. (2003). Terror in the Name of God

[86] Cook, D. (2005). *Understanding Jihad.*

ফলে, তরুণরা জিহাদের আধ্যাত্মিক ও আত্মসংগ্রামের দিক ভুলে গিয়ে একে একটি বাহ্যিক ও সহিংস রাজনৈতিক সংগ্রাম হিসেবে গ্রহণ করতে শুরু করে।

যে সমাজে তরুণেরা প্রকৃত ধর্মীয় জ্ঞান, যুক্তিপূর্ণ চিন্তা ও নৈতিক বিবেচনা থেকে বঞ্চিত হয়, সে সমাজে বিভ্রান্তি স্বাভাবিক। International Centre for the Study of Radicalisation (ICSR)-এর ২০১৬ সালের এক গবেষণায় বলা হয়েছে, তরুণদের উগ্রপন্থী হওয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান কারণ হলো—তাদের মনোজগতে আত্মপরিচয়ের সংকট, ন্যায়বিচারের তৃষ্ণা এবং একটি "অর্থপূর্ণ লড়াই"-এর আকাঙ্ক্ষা। এই জায়গায় সঠিকভাবে ব্যাখ্যা না করলে, অনেক তরুণই জিহাদ নামের আড়ালে বিপথগামী হয়ে পড়ে।[87]

এই সংকট মোকাবেলায় সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো—ধর্মীয় শিক্ষাকে কেবল আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে না দেখে তা বাস্তবজীবনে নৈতিক চরিত্র গঠনের অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। কুরআনের আলোকে জিহাদের আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং আত্মনিয়ন্ত্রণমূলক দিকগুলো তুলে ধরা, সেমিনার, কর্মশালা, এবং তরুণদের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক তৈরি করার মধ্য দিয়ে জিহাদের প্রকৃত ব্যাখ্যা ছড়িয়ে দিতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, যুবসমাজের মধ্যে জিহাদ বিষয়ে যে বিভ্রান্তি বিরাজ করছে, তা কোনো একটি মাত্র কারণে নয় বরং একটি জটিল ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষাগত কাঠামোর ফলাফল। এই বিভ্রান্তি দূর করতে হলে শুধু ধর্মীয় পণ্ডিত নয়, রাষ্ট্র, পরিবার, শিক্ষাব্যবস্থা ও মিডিয়াকেও সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে, যেন জিহাদ ইসলামের মূল শিক্ষা—ন্যায়, আত্মসংযম ও নৈতিক উন্নয়নের প্রতীক হিসেবে তাদের হৃদয়ে স্থাপন পায়।

৫.৩ আধুনিক জাতিরাষ্ট্র এবং জিহাদের প্রাসঙ্গিকতা

আধুনিক ইসলামি জাতিরাষ্ট্র গঠনে জিহাদের ভূমিকা জটিল, কারণ এটি রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও আন্তর্জাতিক বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত। আত্মরক্ষামূলক, নৈতিক ও ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান নেওয়া জিহাদ আজো প্রাসঙ্গিক, কিন্তু তা রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও আন্তর্জাতিক আইন মেনে পরিচালিত হওয়া উচিত। একই সঙ্গে, জিহাদের অপব্যবহার থেকে ইসলামের ভাবমূর্তি রক্ষা করাও জরুরি, যা আজকের মুসলিম দুনিয়ার অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার ধারণাটি ঐতিহাসিকভাবে খিলাফতব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর রাজনৈতিক নেতৃত্বের মাধ্যমে মদিনার রাষ্ট্র গঠন, এবং পরবর্তী সময়ের

[87] ICSR (2016). *Youth Radicalisation Report.*

রাশিদুন, উমাইয়া, আব্বাসিয়া ও উসমানিয়া খিলাফতব্যবস্থা ইসলামের রাজনৈতিক পরিসরকে নির্ধারণ করেছে। কিন্তু ১৯২৪ সালে উসমানিয়া খিলাফতের বিলুপ্তির পর ইসলামি বিশ্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়—ধর্মীয় ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক কাঠামোর অনুপস্থিতি।

বিশ শতকে উপনিবেশবাদের অবসানের পর যেসব নতুন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র গড়ে ওঠে, তাদের বেশিরভাগই জাতীয়তাবাদভিত্তিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থাকে গ্রহণ করে। যেমন ইরাক, মিশর বা সিরিয়ায় দেখা যায় জাতিসত্তার ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে উঠেছে। এসব ক্ষেত্রে ইসলামকে কখনো সম্পূর্ণভাবে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে, কখনো রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে রাখলেও তা ব্যবস্থাগত নয়, বরং সাংস্কৃতিক।

এমন পরিস্থিতিতে, ‘জিহাদ’ ধারণাটি নতুনভাবে আলোচিত হতে শুরু করে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে জিহাদ ছিল ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মিক, সামাজিক ও সামরিক প্রয়াস।[88] কিন্তু আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্রের কাঠামোয় এই ধারার পুনঃপ্রতিষ্ঠা কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ, আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সার্বভৌমত্ব ও সীমান্তের ধারণা খুব স্পষ্ট, যেখানে ‘উম্মাহ’ বা বৈশ্বিক মুসলিম সমাজের ধারণা অনেকাংশে বিমূর্ত।

ইসলামি ভাবধারায় রাষ্ট্র গঠনের এক ব্যতিক্রম উদাহরণ হলো ইরান। ১৯৭৯ সালে ইরান ইসলামি বিপ্লবের মাধ্যমে একটি তত্ত্বভিত্তিক ইসলামি রাষ্ট্র গঠন করে, যেখানে ‘ইমামতের’ ধারণা এবং ‘ভেলায়েতে ফকিহ’ শাসনব্যবস্থা চালু হয়।[89] এই কাঠামোতে জিহাদ শুধুমাত্র সামরিক নয়, বরং সংস্কৃতিগত, অর্থনৈতিক ও নৈতিক ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা পেয়েছে। তবে এই মডেল সকল মুসলিম রাষ্ট্রে গ্রহণযোগ্য হয়নি।

অন্যদিকে, আধুনিক যুগে জিহাদকে অনেক গোষ্ঠী রাষ্ট্রবিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসেবে ব্যবহার করেছে। যেমন, আফগানিস্তানে সোভিয়েত দখলের বিরুদ্ধে বা ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মুসলিম প্রতিরোধ আন্দোলনগুলো নিজেদের ‘জিহাদ’ হিসেবে উপস্থাপন করে। এ প্রসঙ্গে রশিদ গনুশি, ইউসুফ আল-কারযাভি প্রমুখ সমসাময়িক চিন্তাবিদ জিহাদকে ন্যায়ের পক্ষে আত্মরক্ষামূলক ও গণমানুষের অধিকারের প্রশ্ন হিসেবে পুনর্ব্যাখ্যা করেছেন।[90]

---

[88] Cook, D. (2005). *Understanding Jihad.* University of California Press

[89] Keddie, N. (2006). *Modern Iran: Roots and Results of Revolution.* Yale University Press

[90] Al-Qaradawi, Y. (2009). *Fiqh al-Jihad.* Maktabat Wahbah.

তবে, সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলো জিহাদকে ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের একমাত্র উপায় হিসেবে তুলে ধরে, যা একপাক্ষিক এবং ইসলামের মূলনীতির পরিপন্থী। যেমন আইএস বা আল-কায়েদা তাদের সহিংস কর্মকাণ্ডের নৈতিক ভিত্তি হিসেবে জিহাদের অপব্যাখ্যা করে। ফলে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জিহাদের ধারণাটি ভুলভাবে প্রতিফলিত হয় এবং প্রকৃত ইসলামী আদর্শ প্রশ্নবিদ্ধ হয়।

৫.৪ ভূল ব্যাখ্যা প্রতিরোধে সমাজ ও রাষ্ট্রের করণীয়

ইসলামে “জিহাদ” একটি পবিত্র ও বহুমাত্রিক ধারণা, যার মূল অর্থ হচ্ছে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করা—তা হোক আত্মসংযম, নৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা অথবা বৈধ আত্মরক্ষা। কিন্তু আধুনিক সময়ের বহু চরমপন্থী গোষ্ঠী এই পবিত্র ধারণাটিকে বিকৃত করে একে সহিংসতা ও সন্ত্রাসবাদের হাতিয়ার বানিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে সমাজ ও রাষ্ট্রের উভয়েরই দায়িত্ব রয়েছে জিহাদের প্রকৃত তাৎপর্যকে জনসমক্ষে তুলে ধরা এবং এর অপব্যাখ্যার বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

১. শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কার ও ধর্মীয় শিক্ষার আধুনিকীকরণ

জিহাদের ভুল ব্যাখ্যা প্রতিরোধে সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সচেতনতা সৃষ্টি। পাঠ্যপুস্তকে ইসলামি দর্শনের সঠিক ব্যাখ্যা অন্তর্ভুক্ত করে জিহাদ বিষয়ে সম্যক ও ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা যেতে পারে। যেমন, ডেভিড কুক তার গবেষণায় দেখিয়েছেন যে চরমপন্থীরা সাধারণত জিহাদের একমাত্র অর্থ হিসেবে **“সশস্ত্র সংগ্রাম”** প্রচার করে থাকে, অথচ ইসলামী ঐতিহ্যে এর আত্মিক ও নৈতিক দিক অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রেক্ষিতে শিক্ষাব্যবস্থায় কুরআন, হাদীস এবং ফিকহ অনুযায়ী জিহাদের বিভিন্ন মাত্রা (যেমন: জিহাদ আল-নাফস, জিহাদ বিল-ক্বালাম, ইত্যাদি) তুলে ধরা জরুরি।[91]

২. উলামা ও ধর্মীয় নেতাদের সক্রিয় ভূমিকা

ধর্মীয় নেতারাই সমাজে ইসলামী ধারণার ব্যাখ্যাকারী হিসেবে সবচেয়ে প্রভাবশালী। তারা যদি জিহাদ বিষয়ক বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে সোচ্চার হন, তাহলে জনসাধারণ বিভ্রান্ত হবে না। ইউসুফ আল-কারযাভি তাঁর “Fiqh al-Jihad” গ্রন্থে বলেছেন, “চরমপন্থীরা কেবল আয়াত ও হাদিসের আংশিক উদ্ধৃতি দিয়ে ইসলামের সার্বিক নৈতিক কাঠামোকে উপেক্ষা করে।”

[91] Cook, David. (2005). *Understanding Jihad.* University of California Press.

তাই খুতবা, মাহফিল ও গণমাধ্যমে আলেমরা যদি ইসলামের করুণাময় ও ন্যায়ের বার্তাকে গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপন করেন, তা হবে অপব্যাখ্যার বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ।

৩. গণমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমে সচেতনতামূলক প্রচারণা

বর্তমান সময়ে তথ্যপ্রবাহের একটি বড় উৎস হলো গণমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়া। অনেক তরুণ এখান থেকেই ধর্মীয় ধারণা গ্রহণ করে। রাষ্ট্র যদি ডিজিটাল মাধ্যমে ইসলামি শিক্ষার প্রকৃত রূপ তুলে ধরার উদ্যোগ নেয়—যেমন রাষ্ট্রীয় ইউটিউব চ্যানেল, ডকুমেন্টারি, ওয়েবিনার বা টেলিভিশন অনুষ্ঠান—তবে ভুল দিকনির্দেশনা রোধ করা সম্ভব। এছাড়াও রাষ্ট্র সমর্থিত ফতোয়া বোর্ড বা অনলাইন ইসলামি পরামর্শক প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা যেতে পারে।

৪. চরমপন্থী বক্তৃতা ও উপাদানের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ

কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যদি ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থাকে ব্যবহার করে সহিংসতা প্রচার করে, তবে রাষ্ট্রের উচিত তা নিয়ন্ত্রণ করা। এটি করতে গিয়ে অবশ্যই মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও ধর্মীয় অধিকারের সীমা বিবেচনায় রাখতে হবে। কিন্তু বিদ্বেষমূলক বক্তব্য, জিহাদের নামে জঙ্গিবাদের আহ্বান কিংবা ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানো হলে তা দমন করা রাষ্ট্রের আইনি দায়িত্ব।[92]

৫. আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও সহনশীলতার চর্চা

জিহাদের ধারণা মুসলিম সমাজের বাইরেও ভ্রান্তভাবে প্রতিফলিত হয়। তাই ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজকে আন্তঃধর্মীয় সংলাপে এগিয়ে আসতে হবে, যেখানে জিহাদ, সহিংসতা ও আত্মরক্ষার মাঝে পার্থক্য ব্যাখ্যা করে ধর্মীয় সম্প্রীতি গড়ে তোলা সম্ভব। এই সংলাপ শুধু ভুল ব্যাখ্যার প্রতিরোধই করবে না, বরং ইসলামভীতির বিরুদ্ধেও প্রতিক্রিয়া হিসেবে কাজ করবে।

জিহাদ অপব্যাখ্যা শুধু মুসলিম সমাজের ভেতরেই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে না, বরং বৈশ্বিক পর্যায়ে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা ছড়ায়। তাই রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের যৌথ দায়িত্ব জিহাদের প্রকৃত ব্যাখ্যা তুলে ধরা, শিক্ষা ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং চরমপন্থার বিরুদ্ধে নৈতিক ও আইনগত অবস্থান গ্রহণ করা।

আমাদের দায়িত্ব, সকল প্রতিকূলতার মধ্যে দীনী দাওয়াতকে অব্যাহত রাখা এবং পাশাপাশি দীনের যে সকল শিক্ষা বিকৃত করে একজন মুমিনকে উগ্রতায় লিপ্ত করা সম্ভব সেগুলির সঠিক চিত্র মুসলিম উম্মাহর কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করা। আমরা এ গ্রন্থে আমাদের সীমিত

[92] Klausen, 2005

যোগ্যতা ও সীমিত জ্ঞানের আলোকে এ বিষয়ক কিছু তথ্য উল্লেখ করেছি। আশা করছি, যোগ্য ও প্রাজ্ঞ আলিমগণ এগুলির ভুলভ্রান্তি সংশোধন করে এ বিষয়ে আরো উন্নত গবেষণা উম্মাতের জন্য পেশ করবেন।[93]

বস্তুত সমাজকে, সমাজের নেতৃবৃন্দকে বা আলিমগণকে ঘৃণা না করে কেউ সন্ত্রাসী, চরমপন্থী বা জঙ্গি কর্মে লিপ্ত হতে পারে না। আর আলিম-উলামা, পীর-মাশাইখ ও দীনের দাওয়াতে কর্মরত অনেকেই জেনে অথবা না জেনে এরূপ ঘৃণা ছড়াচ্ছেন।

‘‘তাকফীর’’ বা কাফির কথন আমাদের সমাজে বিভিন্নভাবে বিদ্যমান। আমাদের অনেকে খারিজী, মুতাযিলী ও অন্যান্য বিভ্রান্ত ফিরকার ন্যায় দ্ব্যর্থবোধক বক্তব্য, মতামত, মতভেদীয় বিষয় বা মুসতাহাব-মাকরূহ বিষয়াদিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা ব্যাখ্যা দিয়ে কুফরী বলে প্রমাণের চেষ্টা করছেন। দলগত, পদ্ধতিগত বা মাসআলাগত মতভেদে বা কর্মপদ্ধতির ভিন্নতার কারণে একে অপরকে ‘‘ইসলামের শত্রু’’, ‘‘শত্রুদের দালাল’’, ‘‘ইহূদী-খৃস্টানদের এজেন্ট’’, ‘‘নবী-ওলীগণের দুশমন’’, ইত্যাদি বলে পারস্পারিক ঘৃণা উস্কে দিচ্ছেন। এ সবই ‘‘তাকফীর’’ বা কাফির কথনের বিভিন্ন রূপ। এসবই ধর্মীয় উগ্রতা উস্কে দিচ্ছে।

দলগত, পদ্ধতিগত বা মাসআলাগত মতভেদের কারণে ‘‘ইসলামের শত্রু’’, ‘শত্রুদের দালাল’ বা অনুরূপ কোনো বিশেষণে আখ্যায়িত করা বর্জন করতে হবে। কোনো আলিম বা ইসলামী ব্যক্তিত্ব আপনার মতের বিরোধিতা করলে, আপনার সাথে শত্রুতা করলে বা আপনার বিরুদ্ধে ফাতওয়া দিলে আপনি তাকে ইসলামের শত্রু বলে গণ্য করবেন না। বরং বিষয়টিকে তার ইজতিহাদ ও ভুল বলে গণ্য করে হৃদয়ে তার ভালবাসা, কর্মে তার সাথে সৌহার্দপূর্ণ আচরণ ও তার জন্য দুআ অব্যাহত রাখুন। আল্লাহ বলেছেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ‘‘হে মুমিনগণ, কোনো সম্প্রদায় যেন অপর সম্প্রদায়কে উপহাস-বিদ্রূপ না করে; হতে পারে তারা বিদ্রূপকারীদের চেয়ে উত্তম। কোনো নারী যেন অন্য নারীকে বিদ্রূপ-উপহাস না করে; হতে পারে সে বিদ্রূপকারিনী অপেক্ষা উত্তম। আর তোমরা একে অপরকে নিন্দা করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ উপাধি দিয়ে ডেকো না। ঈমানের পর পাপী নাম পাওয়া খুবই খারাপ বিষয়। আর যারা তাওবা করে না তারাই যালিম।’’[94]

93 ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ, ২৫৫-২৫৮

94 সূরা হুজরাত: ১১ আয়াত

সুতরাং , সমাজ ও রাষ্ট্রকে একযোগে কিছু কাজে অগ্রগণ্য হওয়া উচিত। যেমন,

- মাদ্রাসা এবং স্কুল-কলেজের পাঠ্যক্রমে জিহাদ বিষয়ে স্পষ্ট ও সঠিক ব্যাখ্যা থাকা উচিত।
- ইমাম, আলেম এবং বক্তারা যেন মসজিদে বা জনসমক্ষে কুরআন ও হাদীসের আলোকে জিহাদের সঠিক ব্যাখ্যা দেন। এতে করে মানুষ বিভ্রান্ত হবে না।
- বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ইসলামের যুদ্ধনীতি ও জিহাদ বিষয়ে আধুনিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় গবেষণা হওয়া দরকার। এতে করে ভুল তথ্য আর চালানো যাবে না।

৬. উপসংহার

এই গবেষণায় জিহাদ বিষয়ক ইসলামের আসল শিক্ষা, মুসলিম পণ্ডিতদের ব্যাখ্যা, ইতিহাসে এর প্রয়োগ এবং আধুনিক সময়ে ভুলভাবে ব্যবহারের প্রসঙ্গগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ইসলাম ধর্মে জিহাদ মানে কেবল যুদ্ধ নয়, বরং এটা একটি বড় পরিসরের ধারণা—যার ভেতরে আছে আত্মসংযম, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, সমাজ ও মানবতার কল্যাণে চেষ্টা করা।

কুরআনে জিহাদ বলতে অনেক সময় 'তর্ক ও যুক্তির মাধ্যমে' সত্যের পক্ষে দাঁড়ানো বোঝানো হয়েছে (সূরা আল-ফুরকান, আয়াত ২৫:৫২)। আবার এমন অবস্থায় যখন মুসলিমরা আক্রান্ত হয়, তখন আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধকেও জিহাদ বলা হয়েছে (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২:১৯০)। এই দিকগুলো থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়, ইসলাম শুধু অকারণে যুদ্ধ সমর্থন করে না, বরং যুদ্ধের অনুমতি দেয় তখনই যখন সেটা নিরুপায় আত্মরক্ষার জন্য জরুরি হয়ে পড়ে।

ইমাম গাযজালী এবং ইবনুল কাইয়্যিমের মতো পণ্ডিতরা বলেছেন, নিজের খারাপ অভ্যাস, প্রবৃত্তির লোভ ও অহংকারের বিরুদ্ধে লড়াই করাই আসল বা "বড় জিহাদ" (আল-জিহাদুল আকবার)। অন্যদিকে, রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যে সামরিক জিহাদ, সেটাকে তারা শর্তসাপেক্ষভাবে বৈধ বলেছেন—যদি সেটা আত্মরক্ষা হয় এবং বৈধ শাসকের অনুমতিতে হয় (ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক—দেখুন আল-মুয়াত্তা, বদায়েউস সানায়ি)।

তবে দুঃখজনকভাবে, ইতিহাসের বিভিন্ন সময়—বিশেষ করে ঔপনিবেশিক যুগ এবং আধুনিক রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে—জিহাদ ধারণাকে কেউ কেউ নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। যেমন, আফগানিস্তানে সোভিয়েতবিরোধী লড়াইয়ে, বা ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে "জিহাদ" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এক ধরনের রাজনৈতিক প্রতিরোধের ব্যানার হিসেবে।[95] আবার আজকের দিনে কিছু চরমপন্থী গোষ্ঠী এই ধর্মীয় শব্দটিকে ব্যবহার করে সহিংসতা চালায়, নিরীহ মানুষকে হত্যা করে, অথচ ইসলাম এসব স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করেছে।[96]

এদিকে পশ্চিমা মিডিয়া ও রাজনীতিতেও জিহাদকে প্রায়শই "সন্ত্রাস" বা "পবিত্র যুদ্ধ" হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, যা মূলত ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা তৈরি করে এবং মুসলিম

[95] Rashid, Taliban, 2000; Metcalf, 1982

[96] Qur'an 2:190; El Fadl, The Great Theft, 2005

যুবসমাজের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে (Said, Orientalism, 1978)। এই পরিস্থিতিতে, ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে জিহাদের আসল বার্তাকে সামনে আনা খুবই দরকার।

এই গবেষণায় পরামর্শ দেওয়া হয়েছে—জিহাদের প্রকৃত শিক্ষা সমাজে ছড়িয়ে দিতে হলে রাষ্ট্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আলেম সমাজ ও মিডিয়াকে একসাথে কাজ করতে হবে। মাদ্রাসা ও স্কুল-কলেজের পাঠ্যক্রমে জিহাদের আত্মিক ও সামাজিক দিকগুলো যুক্ত করতে হবে, যাতে তরুণ প্রজন্ম চরমপন্থা বা ভুল ব্যাখ্যার ফাঁদে না পড়ে। একই সঙ্গে দরকার মিডিয়ার দায়িত্বশীল আচরণ, যেখানে ইসলামের ন্যায়ের ও শান্তির বার্তা তুলে ধরা হবে।

৬.১ জিহাদ সম্পর্কিত ভুল ধারণা দূরীকরণের গুরুত্ব

ইসলামের অন্যতম উচ্চতর নৈতিক ধারণা "জিহাদ"। কিন্তু ইতিহাসের মোড় ঘুরতেই শব্দটির অর্থ যেন খসে পড়ে শুধু একরৈখিক, সহিংস এক রাজনৈতিক প্রতীকে। এ অবস্থায় ভুল ব্যাখ্যাগুলো শুধু ধর্মীয় জ্ঞানহীনতার ফল নয়; বরং তা রাজনৈতিক কৌশল, সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব ও মিডিয়ার প্রভাব মিলে এক জটিল জ্ঞান-রাজনীতি তৈরি করেছে। এই প্রেক্ষিতে জিহাদ সম্পর্কিত ভুল ধারণা দূর করা হয়ে দাঁড়িয়েছে শুধু বিশ্বাস রক্ষার দায়িত্ব নয়—বরং একটি আন্তর্জাতিক নৈতিক, জ্ঞাননৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দায়িত্ব।

প্রথমত, জিহাদের বিভ্রান্তিপূর্ণ ব্যাখ্যার কারণে ইসলামের মৌল নৈতিক কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ইসলামের বুনিয়াদি মূল্য—আত্মসংযম (جهاد النفس), ন্যায়ের প্রতি দৃঢ়তা, এবং নিপীড়িতদের পক্ষাবলম্বন—জিহাদের মধ্যে নিহিত। অথচ একে কেবলমাত্র সহিংস সশস্ত্র লড়াই হিসেবে উপস্থাপন করার ফলে ধর্মের নিজস্ব ভাষা, অভিপ্রায় ও সৌন্দর্য বিবর্ণ হয়ে পড়ছে।[97] ফলে মুসলিম সমাজে ধর্মচর্চা আত্মিক পরিশুদ্ধির পথে না গিয়ে জঙ্গিবাদের ছায়া নিতে শুরু করে।

দ্বিতীয়ত, তরুণ প্রজন্মের আত্মপরিচয় গঠনে জিহাদ নিয়ে ভুল ধারণা এক ভয়াবহ অন্তঃসারশূন্যতা তৈরি করছে। একজন তরুণ যখন দেখে তার ধর্মকে সর্বত্র সহিংসতার উৎস হিসেবে চিত্রিত করা হচ্ছে, তখন সে হয় আত্মরক্ষার নামে চরমপন্থার দিকে ঝুঁকে পড়ে, নয়তো আত্মগ্লানিতে ধর্মচ্যুত হয়। উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের জন্য এটি এক দারুণ ক্ষতির কারণ। গবেষণা বলছে, ধর্মীয় বিভ্রান্তি ও রাজনৈতিক বঞ্চনার সংমিশ্রণই

[97] Khaled Abou El Fadl, *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*, HarperOne, 2005.

তরুণদের চরমপন্থার দিকে ঠেলে দেয় (ICSR Report, 2016)। ফলে জিহাদ বিষয়ক সঠিক তথ্য ও প্রেক্ষাপট তুলে ধরা না গেলে, চরমপন্থা রোধ প্রায় অসম্ভব।

তৃতীয়ত, ভুল ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া আন্তর্জাতিক নিরাপত্তারও অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, সীমান্তরক্ষা ও বিশ্ব কূটনীতিতে ধর্মের ব্যবহার নতুন কিছু নয়। কিন্তু ধর্মকে ভয়ের প্রতীক বানিয়ে যে ধরনের "নিরাপত্তা রাজনীতি" (securitization of Islam) গড়ে উঠছে, তাতে পুরো মুসলিম জনসমাজকে অবিশ্বাসের চোখে দেখা হচ্ছে।[98] এর ফলে মুসলিমদের ওপর বৈষম্যমূলক আইন, মাইক্রো-আগ্রেশন ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হচ্ছে—যা দীর্ঘমেয়াদে রাষ্ট্রের ভেতরে সংকট তৈরি করে।

চতুর্থত, ইসলামি ঐতিহ্য এবং ফিকহি কাঠামোর মধ্যেই জিহাদের সীমারেখা স্পষ্টভাবে নির্ধারিত। ইমাম মালিক, শাফি, আবু হানিফা ও আহমদ ইবনে হাম্বাল সকলেই বলেছেন—যুদ্ধ কেবল বৈধ শাসকের অধীনে, প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে, নিরীহ জনতার জানমালের ক্ষতি না করে হতে পারে।[99] এই স্পষ্ট সীমা শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে না ছড়ালে, চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলো সেই ফাঁক গলে নিজেদের মতবাদ ঢুকিয়ে দেবে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো—জিহাদ বিষয়ে ভুল ধারণা ভেঙে দিতে না পারলে, ধর্মভিত্তিক সহিংসতা ও ইসলামভীতির একটি নেতিবাচক চক্র চালু থাকবে, যা কেবল ধর্ম নয়, গোটা মানবসমাজের সহাবস্থান ও সহনশীলতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। কারণ যে সমাজে বিশ্বাস ও যুক্তি পাশাপাশি চলে না, সে সমাজে জঙ্গিবাদ যেমন জন্ম নেয়, তেমনি জন্ম নেয় ধর্মবিদ্বেষও। একমাত্র দায়িত্বশীল ব্যাখ্যা, একাডেমিক চর্চা, এবং আন্তঃধর্মীয় সংলাপই পারে এই অন্ধকার থেকে মুক্তির পথ তৈরি করতে।

---

[98] Edward Said, *Covering Islam: How the Media and the Experts Determine How We See the Rest of the World*, Vintage, 1981.

[99] Peters, Rudolph, *Jihad in Classical and Modern Islam*, Markus Wiener Publishers, 1996.

জিহাদ সংক্রান্ত কিছু বই

এই রিসার্চের কাজে যে সকল বই ব্যবহার করা হয়েছে তার একটি তালিকা নিচে তুলে ধরা হলো। আশাকরি পরবর্তী গবেষকরা এই বইগুলো থেকে উপকৃত হবে। ইনশাআল্লাহ!

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক	প্রকাশনী
১	দাওয়াত ও জিহাদ	ড. আসাদুল্লাহ আল গালিব	হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
২	জিহাদের স্থায়ী ও অবিচল বিষয়সমূহ	শাইখ ইউসূফ আল উয়াইরি	আল ক্বাদিসিয়াহ মিডিয়া
৩	ই'দাদ : একটি ভূলে যাওয়া ফরয	মুফতি আব্দুল ওয়াহহাব	-
৪	জিহাদ ও ক্বিতাল	ড. আসাদুল্লাহ আল গালিব	হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
৫	জিহাদ ও জঙ্গীবাদ : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ	ড. মুহাম্মদ কাবীরুল ইসলাম	শ্যামলবাংলা প্রকাশনী
৬	ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ	ড. খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর	আসসুন্নাহ পাবলিকেশন্স
৭	ফিকহুল জিহাদ	ড. ইউসূফ আল-কারযাভি	-

উল্লেখিত বইপুস্তক ব্যতীত আরো কিছু ওয়েবসাইট থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে -

ক্রমিক	ক্যাপশন	লিংক
১	ক্রুসেড (ইতিহাস, ফলাফল, ও প্রভাবসমূহ)	https://www.waytojannah.net
২	জিহাদ ও উগ্রবাদ এক নয়	https://al-itisam.com
৩	জিহাদের উদ্দেশ্য কি শুধুই অমুসলিমদেরকে হত্যা করা?	https://response-to-anti-islam.com
৪	জিহাদ কি? জিহাদ কত প্রকার	https://www.idfbd.com

যারা উক্ত গবেষণাপত্রটি ধৈর্যসহকারে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ও তার রাসূল সঃ -এর সন্তুষ্টির জন্য পড়েছে, আল্লাহ আমাদের সবাইকে ক্ষমা করুন, আমাদেরকে শাহাদাতের আমৃত্যের সুধা পান করার তাউফিক দান করুন এবং IOM এর সকল শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও এই রিসার্চের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে কবুল করে নিন। আমিন!

জাযাকুমুল্লাহু খাইরান, ওয়া বারাকাল্লাহু ফিকুম!